গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ১৬ - ২২ মে ২০০৮ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

নন্দীগ্রাম দেখাল আন্দোলনই মানুষকে শক্তি দেয়

নন্দীগ্রামের সাধারণ মানুষ আবার তাঁদের সংগ্রামী চরিত্র ও প্রত্যয়ের পরিচয় রাখলেন ১১মে পঞ্চায়েত ভোটের দিন। সিপিএমের লাগাতার হামলা, প্রকাশ্য হুমকি ও সন্ত্রাস উপেক্ষা করে যেভাবে তাঁরা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন, তা অনেকের কাছেই ছিল অভাবনীয়।

ভোটের দিন নন্দীগ্রামের মানুষ কী করবেন, এ নিয়ে সারা রাজ্যের তো বটেই, সমগ্র দেশের সচেতন মানুষেরই গভীর উদ্বেগ ছিল। কারণ, ভোট এগিয়ে আসতেই সিপিএম বাহিনী যেরকম দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করে, সাধারণ মানুষের ভোটকেন্দ্রে যাওয়া আটকাতে যথেচ্ছ বোমা-গুলি ছুঁড়তে থাকে এবং ১১মে যারা ভোট দিতে যাবে, তাদের হাত কেটে নেওয়া হবে বলে হুমকি দেয়, তাতে সন্ত্রস্ত মানুষ আদৌ ভোট দিতে পারবে কি না, সেটাই ছিল বড় প্রশ্ন। রাজ্য নির্বাচন কমিশন বলেই দিয়েছিল তাদের কোনও ক্ষমতা নেই। পুলিশের ভূমিকা কী হবে তা জানাই ছিল। রাজ্য পুলিশের অধীনে সি আর পি-র ভূমিকা অন্য কিছু হবে না, এটাও মানুষ ধরে নিয়েছিলেন। যে জন্য ভোটের আগের দিন সি আর পি-র ডি আই জি অলক রাজ নন্দীগ্রামে পৌঁছনোয় ঘরছাড়া মানুষ তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য কাতর আবেদন জানায় এই আশা নিয়ে যে, ইতিপূর্বে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তায় এই অফিসার যে ইতিবাচক ভূমিকা দেখিয়েছিলেন, এবারও তিনি তা করবেন। ভোটের দিন ঐ অফিসার সেই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে কীভাবে সিপিএমের রোষের মুখে পড়েন, সিপিএম নেতা লক্ষ্মণ শেঠ কী ভাষায় তাঁকে হুমকি দেন ও অলক রাজ তার কী জবাব দেন — সবই এখন রাজ্যের মানুষ জানেন।

এই ঘটনা থেকে যদি এ কথা মনে করা হয় যে, সি আর পি-র ভূমিকাই ভোটের দিন নন্দীগ্রামের জনগণকে মূল শক্তি দিয়েছে, তা হলে বিচারে ভুল হবে। কারণ, নন্দীগ্রামবাসী জানেন, ভোটের পর সি আর পি চলে যাবে এবং এ কথা সিপিএম নেতারাও বারবার শুনিয়েছেন, যার অর্থ কী, তা নন্দীগ্রামের নির্যাতিত মানুষের চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। তবুও ভোট দিতে যাওয়ার আগে এ শক্তি তাঁরা পেলেন কীসের জোরে? শহিদ পরিবারের পিতামাতা ও পরিজনরা, ধর্ষিতা মা-বোনেরা চোখের জল ফেলতে ফেলতেই ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন; অসুস্থ অশক্ত বৃদ্ধরাও প্রখর রোদে লাইনে দাঁড়িয়েছেন, হাসপাতালের বেড ছেড়ে অসুস্থ ও আহতরা পর্যন্ত ছুটে গিয়েছেন। একটাই অঙ্গীকার — ভোট দিতেই হবে। এস ইউ সি আই-এর যে সব নেতা-কর্মীরা হাসপাতাল ও ত্রাণশিবিরে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁরাও ভাগে ভাগে গিয়ে ভোট দিয়ে এসেছেন।

দীর্ঘ ১৮ মাস ধরে নির্যাতিত, স্বামী-পুত্র-স্ত্রী হারা মানুষ, ধর্ষিতা মা-বোনেরাও, এমনকী এখনও সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করেও ভোট দেওয়ার এই শক্তি পেলেন কোথা থেকে? আন্দোলনই তাঁদের এই শক্তি দিয়েছে। ১৮ মাস ধরে লাগাতার আক্রমণের সামনেও তাঁরা মাথা নত করেননি। আক্রমণ যত বেড়েছে, প্রতিরোধের মনোবল যেন ততই দৃঢ় হয়েছে। সন্তানহারা পিতামাতা বলেছেন, এক সন্তান শহীদ হয়েছে, প্রয়োজনে আরও সন্তানকে এগিয়ে দেব; কিন্তু আন্দোলন ছাড়ব না। ধর্ষিতা হয়েও মা-বোনেরা মাথা উঁচু করে প্রতিবাদে প্রতিরোধে দাঁড়িয়েছেন — শক্তি দিয়েছে, মর্যাদাবোধ দিয়েছে আন্দোলনই। ভোটের দিনও কী করতে হবে, তা সাধারণ মানুষ স্বকীয় উদ্যোগেই স্থির করেছেন। এই নিজস্ব উদ্যোগের ভিত্তিও সংগঠিত গণআন্দোলন। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলে, পাড়ায় পাড়ায় গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করে, আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে জনগণ স্বকীয় উদ্যোগের জন্ম দিতে পেরেছেন। তারই সাক্ষ্য পাওয়া গেল ভোটের দিন।

সংগঠিত আন্দোলন শুধু দাবি আদায়েরই একমাত্র পথ নয়, আন্দোলনই একমাত্র মানুষকে চরিত্র দেয়, দৃঢ়তা দেয়, মর্যাদাময় জীবনের সন্ধান দেয়। অসংগঠিত যে মানুষ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অসহায় বোধ করে, সংগঠিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে সেই মানুষই সাহসে তেজে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। এভাবেই তো নন্দীগ্রামের অজ্ঞাত অখ্যাত গরিব চাষী-মজুররা সমগ্র দেশের জনসাধারণের কাছে লড়াইয়ের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।

নন্দীগ্রামের বেশ কিছু অঞ্চলের বুথ সিপিএম ক্রিমিনালবাহিনী দখল করেছে, ছাপ্পা মেরেছে, বুথ জ্যামের কৌশল নিয়ে ভোট আটকাতে চেয়েছে, কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে নন্দীগ্রামের মানুষের ভূমিকা, যেখানে ভোটকেও তারা একটা আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং আন্দোলনের শক্তির জোরেই মাথা উঁচু করে নিজেদের শপথ ঘোষণা করেছেন। এ ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলার নির্যাতিত মানুষের কাছে আবার একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। নন্দীগ্রামবাসীকে জানাই লাল সেলাম।

সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে এস ইউ সি আই-এর স্মারকলিপি

৯ মে এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস্ শঙ্কর সাহা, অচিন্ত্য সিন্‌হা ও স্বপন ঘোষ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি জানান। নির্বাচনের আগেই পুলিশ ও প্রশাসনের প্রশ্রয়ে সিপিএমের সন্ত্রাসের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তাঁরা স্মারকলিপি আকারে পেশ করেন। আলোচনার পর নির্বাচন কমিশনার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয় — "পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসকদল সিপিএম এ রাজ্যের জেলায় জেলায় যে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছে তাতে এস ইউ সি আই গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সাধারণ মানুষ আক্রান্ত, ভীত, সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত। রাজ্যের কোথাও স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে না। জেলায় জেলায় শাসক সিপিএম দলের ক্রিমিনালবাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন, ঘরে ঘরে হামলা, নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর নৃশংস অত্যাচার এবং বিরোধী দলের প্রার্থীদের নির্মমভাবে মেরে আহত করা, এমনকী মহিলাদের ওপর লাগামছাড়া আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোথাও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ থানায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক, আক্রান্ত সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেই পুলিশ মিথ্যা মামলা দায়ের করছে, থানায় আটকে রেখে মারধর করছে, কোনও অভিযোগ লিপিবদ্ধ করছে না, এফ আই আর নিচ্ছে না, সিপিএম গুন্ডাবাহিনীকে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও পরোক্ষে মদত দিচ্ছে। পুলিশের এই ভূমিকায় সিপিএম গুন্ডাবাহিনী কার্যত আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এইরকম সন্ত্রাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচন কার্যত প্রহসনে পর্যবসিত হবে। এ সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। নন্দীগ্রাম ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকে নন্দীগ্রামে সিপিএম ক্রিমিনালবাহিনী ভয়াবহ অত্যাচার শুরু করেছে এবং এই অত্যাচারের মাত্রা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। গ্রামের পর গ্রাম গুলি চালিয়ে ও বোমাবাজি করে তারা ঘরবাড়ি লুঠ করছে, মারধর করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। থানায় জানালেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ৩০ এপ্রিল থেকে নন্দীগ্রাম ১নং ও ২নং ব্লকের ১৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬০টি বুথ আক্রান্ত। সিপিএম ক্রিমিনাল বাহিনীর আক্রমণে ১১ হাজার মানুষ ঘরছাড়া। একশ'র বেশি ঘরবাড়ি তারা ভেঙে দিয়েছে এবং লুঠ করেছে। মহেশপুর এবং নন্দীগ্রাম, এই দু'টি ত্রাণশিবিরে আছে ১২০০-র উপর মানুষ, তার মধ্যে ৪০০-র বেশি মহিলা এবং

দুইয়ের পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমকে পরাস্ত করার আহ্বান

৯ মে এস ইউ সি আই-এর ডাকে জয়নগর ২নং ব্লকের বাইশহাটা, গড়দেওয়ান ও বেলে দুর্গানগর অঞ্চলের এক সম্মিলিত জনসভা প্রিয়'র মোড়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড ওয়াহাব হালদার। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্যকমিটির সদস্য ও বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী।
সভায় বিশেষ বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নন্দীগ্রাম আন্দোলনের নেতা কমরেড নন্দ পাত্র, ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির শেখ শাহ্ আলম ও আরতি খাটুয়া।

গণআন্দোলনের পতাকা নিয়ে কর্নাটকে ১২টি আসনে লড়ছে এস ইউ সি আই

৯ মে কর্নাটকে প্রথম দফা নির্বাচনে ২২৮ টি আসনের মধ্যে ৮৯টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। পরবর্তী দু-দফায় ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হবে।

ওয়াল-রাইটিং, পোস্টারিং-এ নিষেধাজ্ঞা, সভাসমিতি ও মাইকপ্রচারের উপর নানারকম অনুমতির ফাঁস পরিয়ে বাস্তবে জনগণের মতপ্রকাশের উপরই অঘোষিত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ফলে নির্বাচনে জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটবে না — কর্নাটকের বেলারিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী এই অভিযোগ করেন। উপস্থিত ছিলেন কর্নাটক রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড কে উমা। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের নীতি অনুসারে সরকার যেসব জনবিরোধী পদক্ষেপ নিয়েছে, নিষেধাজ্ঞার ফলে সেগুলি জনগণের কাছে ঠিকমতো তুলে ধরা যায়নি।

সংসদীয় রাজনীতির বিচারে কর্নাটকে সংকট খুবই গভীর। জনসাধারণ কোনও একটি বিশেষ দলের উপর আস্থা রাখতে পারছে না, সেই সঙ্গে নির্বাচনে জাতপাতভিত্তিক ভোটদানে শাসকদল ও হবু শাসকদলগুলির উৎসাহ দান এবং ক্ষমতা দখলের জন্য চরম সুবিধাবাদী রাস্তা গ্রহণের ফলে কর্নাটকে কোনও সরকার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত টিকতে পারছে না। পার্লামেন্টারি অর্থে এ রাজ্যের তিন প্রধান দল কংগ্রেস, জনতা দল (এস) এবং বিজেপি কেউই তাদের জোট সরকার টিকিয়ে রাখতে পারেনি।

২০০৪ সালের নির্বাচনের পর, একে একে কংগ্রেস-জনতা দল (এস) এবং বিজেপি-জনতা দল (এস)-এর জোট সরকার গদিতে বসলেও কোনও সরকারই মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি। ২০০৭ সালে জনতা দল (এস)-এর সমর্থনে বিজেপি নেতা ইয়েদুরিয়াপ্পার যে সরকার গদিতে বসে, তা কোনও মতে দিন সাতেকের বেশি টিকতে পারেনি। ইতিমধ্যে গদিতে যে সরকারই থাক জনজীবনের সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়াও থেমে থাকেনি। শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্রমাগত দুর্মূল্য হয়েছে, মানুষ অর্থলাভের আশায় জুয়ার দিকে ঝুঁকছে। অনলাইন লটারির বিপুল প্রসার সামাজিক জীবনকে বিধ্বস্ত করেছে। এই অবস্থার মধ্যে গণআন্দোলনকে তীব্র করার শপথ নিয়ে রাজ্যের সাতটি জেলায় ১২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এস ইউ সি আই।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী কৃষক আত্মহত্যার নিরিখে কর্নাটক হল দেশের শীর্ষস্থানে। ২০০১-২০০৬ এই পাঁচ বছরে কর্নাটকে ৮৬০০ কৃষক বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। রাজ্যের মাত্র ২৫ শতাংশ জমিতে সেচের সুযোগ রয়েছে। কৃষির এই সংকটজনক অবস্থার সুরাহার কোনও চেষ্টা না করে, নন্দগুড়ি, মহীশূর, গুলবর্গা, বেলারি, ধারওয়ার, কোপ্পাল প্রভৃতি জায়গায় এস ই জেড তৈরি করার কর্মসূচি নিয়ে চাষীদের একমাত্র অবলম্বন জমি কেড়ে নিয়ে কর্নাটক সরকার তা দিয়ে দিচ্ছে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের হাতে। শিল্পায়নের প্রবল প্রচারের মধ্যেই গত সাত বছরে ৮৮,০০০ কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেবল সরকারি দপ্তরের চাকরিতেই নয়, সরকার অধিগৃহীত সংস্থা, কলেজ, হাসপাতাল, জনসেবামূলক সংস্থাগুলিতেও স্থায়ী নিয়োগের বদলে শুরু হয়েছে চুক্তিতে নিয়োগ, যার ফলে কর্মচারীরা চাকরি শেষে সামাজিক সুরক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানেও কালোবাজারি মজুতদারির ফলে খাদ্যদ্রব্যের দাম লাগামছাড়া হারে বাড়ছে।

কর্নাটকে সি পি এম, সি পি আইয়ের যতটুকু শক্তি আছে সেটাকেও তারা গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজে লাগাতে নারাজ। সি পি আই কিছু আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সি পি এম পায়ের তলায় জমি না পেয়ে নদীর জল ভাগাভাগি, ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নে আঞ্চলিকতাবাদকে প্রশ্রয় দিতে পর্যন্ত কসুর করেনি। কিন্তু এবারের নির্বাচনে অন্যান্য বুর্জোয়া দল তাদের চাহিদা মতো আসন ছাড়তে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সি পি এম এককভাবে ১২টি আসনে লড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের দল এবং গণসংগঠনগুলি ক্ষমতাসীন দল ও জোটের সর্বনাশা অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই অনলাইন লটারি বন্ধ করা, বি পি এল কার্ড দেওয়া, শস্যবীমা চালু করা, কৃষিঋণ মকুব করা, স্কুলস্তরে যৌন শিক্ষা চালু করার সরকারি চেষ্টা বন্ধ করা, শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফি-বৃদ্ধি প্রত্যাহার করা প্রভৃতি দাবিতে আমাদের দল কর্নাটক রাজ্যে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন গড়ে তুলেছে। গণআন্দোলনের এইসব দাবিগুলি রাজ্য বিধানসভায় তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১২ টি আসনে এস ইউ সি আই লড়ছে।

কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থী তালিকা

জেলা ঃ বাঙ্গালোর

১। মালেশ্বরম- কমরেড এম এস প্রকাশ

২। বিজয়নগর- কমরেড এম এন শ্রীরাম

৩। বাসাবানাগুড়ি- কমরেড ভি এন আর শেখর

৪। রাজাজিনগর- কমরেড বি এস পার্থিবকুমারী

মহীশূর

৫। চামরাজা- কমরেড এম শশীধর

বেলারি

৬। বেলারি সিটি - কমরেড এম এন মঞ্জুলা

৭। বেলারি রুরাল- কমরেড এ এন দেবদাস

রায়চুর

৮। রায়চুর সিটি - কমরেড অপর্ণা বি আর

গুলবর্গা

৯। গুলবর্গা দক্ষিণ - কমরেড ভি নাগাম্মল

১০। গুলবর্গা উত্তর - কমরেড কে সোমশেখর

ধারওয়ার

১১। ধারওয়ার পশ্চিম - কমরেড রামাজিআপ্পা

বিজাপুর

১২। বিজাপুর সিটি - কমরেড বি ভগবান

নির্বাচন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি

একের পাতার পর

শিশু। ৮ মে রাত্রে মহেশপুর ত্রাণ শিবিরে সিপিএম ক্রিমিনালরা হামলা চালায়, ফলে সেখান থেকে বহু মানুষ নন্দীগ্রাম ত্রাণ শিবিরে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। সিপিএম ক্রিমিনালবাহিনীর আক্রমণে ৩০ এপ্রিল থেকে ৮ মে পর্যন্ত আহত হয়ে নন্দীগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি আছে ৪৭ জন, তমলুক হাসপাতালে ১৪ জন এবং কলকাতার এস এস কে এমে ৩জন। প্রশাসন ও পুলিশের আশ্বাসে ত্রাণ শিবির থেকে মহেশপুরে ১৫০ জন এবং গড়চক্রবেড়িয়ায় ৮০ জন গ্রামে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের আশ্বাস সত্ত্বেও পুনরায় ঘরে ফেরা মানুষরা আক্রান্ত হয়। খেজুরি, কেশপুর, গড়বেতা, মগরাহাট, ডায়মন্ডহারবার এবং মেটিয়াবুরুজ থেকে ৭০০-র উপর ক্রিমিনাল নন্দীগ্রামে জড়ো করে সিপিএম এই হামলা চালাচ্ছে। এর সাথে ১০০-র উপর সশস্ত্র মোটর সাইকেলবাহিনী গ্রামে গ্রামে গুলি ও বোমাবাজি করে এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। এ পর্যন্ত আক্রান্ত মানুষদের পক্ষ থেকে থানায় ৮৮টি ডায়েরি করা হয়েছে এবং তার কপি বিডিও-কেও দেওয়া আছে। কিন্তু কোন দুষ্কৃতীকে আজ পর্যন্ত পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি।

২। নদীয়া ঃ নদীয়া জেলার তেহট্ট-২/২নং জেলা পরিষদ কেন্দ্রের এস ইউ সি আই প্রার্থী মুসাবুদ্দিন মন্ডল গত ৭ মে নির্বাচনী প্রচারের সময় সিপিএম গুন্ডাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হন, তারা তাঁকে মারধর করে এবং তাঁর প্রচারগাড়ি ভাঙচুর করে। ফোনে এ ঘটনা তিনি থানায় জানালে ডিউটিরত অফিসার তাঁকে থানায় এসে এফ আই আর করতে বলেন। তিনি থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ এফ আই আর গ্রহণ করেনি উল্টে থানার সাব-ইন্সপেক্টর কাঞ্চন বসু এস ইউ সি আই প্রার্থী মুসাবুদ্দিন মন্ডলকে আটক করে মারধর করেন। অথচ আক্রমণকারী সি পি এম গুন্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

৩। দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ ক) গত ৬ মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলী থানার মৈপীঠ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনোদপুরে সিপিএম-এর ১৫/২০ জন দুষ্কৃতী সিপিএম-এর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সরদারের পুত্র তরুণ সরদার এবং অঞ্চল প্রধান সুশীল প্রধানের নেতৃত্বে বন্দুক, পিস্তল, লোহার রড, শাবল ইত্যাদি নিয়ে নাগরিক কমিটির প্রার্থী ও সাধারণ মানুষের উপর ব্যাপক হামলা চালায়। দুষ্কৃতীরা নাগরিক কমিটির সমর্থক চৈতন্য দাসের কান কেটে নেয় এবং বর্বর হামলায় সুবল দাস সহ বেশ কিছু মানুষ আহত হন। সাধারণ মানুষ সিপিএম-এর এই নৃশংস আক্রমণ প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন এবং বন্দুক-পিস্তল সহ ৯জন দুষ্কৃতীকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কপিল বাজকা নামে একজন মাত্র দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে, বাকি ৮জনের নামে এফ আই আর এবং জামিন অযোগ্য কেস থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়। অথচ বিস্ময়ের কথা, দুষ্কৃতীর আক্রমণে কান কাটা অবস্থায় আহত চৈতন্য দাস এবং গুরুতর আহত সুবল দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেয়। যে দুষ্কৃতীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তারা হল, ১) তরুণ সরদার, ২) দীনবন্ধু হালদার, ৩) জয়দেব হালদার, ৪) ভীম হালদার, ৫) মহীতোষ হালদার, ৬) চুনীলাল হালদার, ৮)পঞ্চানন মন্ডল। শুধু তাই নয়, ৭ মে সিপিএম দুষ্কৃতীরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী নিবারণ জানা এবং তাঁর ইলেকশন এজেন্ট শক্তি জানাকে প্রচন্ড মারধর করে আটকে রাখে। ৮ মে আবারও তারা হামলা চালায় এবং কিশোরীমোহনপুরের ভৃগুরাম মন্ডলকে তুলে নিয়ে যায় এবং ডাঃ রবি দাসের হাত ভেঙে দেয়।

কুলতলীর পূর্ব গুড়গুড়িয়ার ভাসাতে পুলিশ মধু চুরি সহ নানা মিথ্যা অভিযোগে আমাদের দলের কর্মী প্রবোধ হালদার সহ ৬জনকে গ্রেপ্তার করে জামিন অযোগ্য ধারা দিয়ে জেলে আটক করেছে। এর ফলে আমাদের দলের নির্বাচনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

এই ধরনের ঘটনা জেলায় জেলায় ঘটে চলেছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিপিএম গুন্ডাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধে পুলিশ শুধু নিষ্ক্রিয়ই নয়, কার্যত এই ধরনের ঘটনা পুলিশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে ঘটে চলেছে। বুথগুলিতে ভোটাররা কোথাও সুরক্ষিত নয়।

নির্বাচন কমিশনে প্রদত্ত ঐ স্মারকলিপির সাথে জেলাগুলিতে ঐ সময় পর্যন্ত যে ভোটকেন্দ্রগুলিতে মারাত্মক গন্ডগোলের আশঙ্কা রয়েছে তার একটি তালিকা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্রিমিনালদের তালিকা দেওয়া হল।

এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটি আশা করে প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দলের দাবি ঃ

১। নন্দীগ্রামে সিপিএম ক্রিমিনালদের হামলার মদতদাতা পূর্ব মেদিনীপুরের এস পি এবং নন্দীগ্রামের ও সি-কে অপসারণ করতে হবে। হামলা দমনে ও জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশকে সক্রিয় হতে হবে এবং নন্দীগ্রাম-খেজুরি সীমান্ত সিল করতে হবে।

২। নন্দীগ্রাম সহ রাজ্যের সর্বত্র নির্বিঘ্নে পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনার জন্য, জনজীবনের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে সি আর পি এফকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে এবং ভোটারদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ভোটার আইডেনটিটি কার্ড ফেরতের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের সর্বত্র সিপিএম গুন্ডাবাহিনীর হামলা দমনে, জনজীবনে নিরাপত্তা রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

৪। গৃহচ্যুত শরণার্থীদের প্রয়োজনীয় রিলিফ দিতে হবে এবং আহতদের চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। উৎখাত হওয়া সাধারণ মানুষকে নিরাপদে বাসস্থানে ফেরার ও স্বাভাবিকভাবে বসবাস করার বন্দোবস্ত সরকারকে করতে হবে।

৫। দাগি ক্রিমিনাল ও খুনিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।

অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের প্রতিবাদে পাঁশকুড়া কলেজে ডি এস ও-র আন্দোলন

গত কয়েক বছর ধরে পার্ট-ওয়ান, পার্ট-টু এবং পার্ট-থ্রি পরীক্ষার সময় অন্য কলেজ থেকে আসা পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে জেনারেটর খরচের নাম করে টাকা তুলত পাঁশকুড়া, তমলুক, ঘাটাল সহ বেশ কিছু কলেজ কর্তৃপক্ষ। ছাত্ররা পরীক্ষার জন্য সেন্টার ফি দিলেও ওই অতিরিক্ত অর্থ আদায় চলছিল। কোনও ছাত্র টাকা দিতে অসম্মত হলে তাকে হেনস্থা করা হত।

পাঁশকুড়া কলেজে এ বছর ছাত্রপিছু ৩০ টাকা করে জেনারেটর ফি নেওয়ার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও র কলেজ কমিটির পক্ষ থেকে অধ্যক্ষের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবি জানানো হয়, রসিদ ছাড়া অন্যায়ভাবে টাকা নেওয়া বন্ধ করতে হবে। সেন্টার ফি নেওয়া সত্ত্বেও কেন অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে, জানতে চাইলে অধ্যক্ষ জবাব দিতে পারেননি। যদিও অধ্যক্ষের হিসাব অনুযায়ী একদিনে জেনারেটর খরচ বাবদ ৫৬৫ টাকা খরচ হলে ৬ দিনে ৩৩৯০ টাকা খরচ হবার কথা। কলেজের মোট ১০৮৫ জন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩০ টাকা করে আদায় করলে ৩২৫৫০ টাকা আদায় হয়। অর্থাৎ প্রায় ৯ গুণেরও বেশি টাকা কর্তৃপক্ষ আদায় করছে। অধ্যক্ষ এই প্রশ্নেরও কোনও জবাব দেননি, অধ্যক্ষকে দেওয়া স্বাক্ষরপত্রে ৮৬ জন অভিভাবকও স্বাক্ষর দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা করা হয়।

সুবিধাবাদের গর্ভ থেকেই বামফ্রন্টের জন্ম

পঞ্চায়েত নির্বাচনে চেষ্টা সত্ত্বেও শরিকদের মধ্যে সার্বিক ঐক্য হয়নি বলে আক্ষেপ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু, অনৈক্যের জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপিকে দায়ী করে বলেছেন, দুঃখের কথা, রাজ্যের সর্বত্র বামফ্রন্টের আসন নিয়ে বোঝাপড়া হয়নি। ফ্রন্ট শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি নেতারা এই অনৈক্যের জন্য বিমান বসু সহ সিপিএম নেতাদের সংকীর্ণ মানসিকতাকেই দায়ী করেছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ বলেছেন, ফ্রন্ট চেয়ারম্যান নয়, বিমানবাবু সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক হিসাবেই বেশি ভূমিকা পালন করছেন। তিনি এমনও বলেছেন, ''বিমানবাবুর এহেন ভূমিকায় আমরা লজ্জিত, ব্যথিত''।

এবার রাজ্যের পাঁচ হাজারেরও বেশি আসনে সিপিএমের সঙ্গে শরিকদের সরাসরি দলীয় প্রতীকে লড়াই হচ্ছে। গতবারের থেকে এ বার বেশি আসনে ঐক্য হয়েছে বলে বিমানবাবু জানালেও অশোকবাবুরা তা মানতে নারাজ। আরএসপি'র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মনোজ ভট্টাচার্য বলেছেন, তাঁরা যে আড়াই-তিন হাজার আসনে প্রার্থী দিয়েছেন, তার মধ্যে ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রেই ঐক্য হয়নি। তিনি বলেছেন, সিপিএম যেভাবে কিছু জায়গায় আরএসপি সমর্থকদের উপর হামলা চালাচ্ছে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করাচ্ছে, তাতে ঐক্যের বাতাবরণ তৈরি করা অসম্ভব। তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বত্রই সিপিএমের গোঁজ প্রার্থী দেওয়ার অভিযোগও করেছেন তিনি। সিপিআইয়ের ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটেছে। যেমন, ফ্রন্টের বৈঠকে মেদিনীপুর সদর ব্লকে সিপিআইয়ের জন্য বরাদ্দ হওয়া ১০০ শতাংশ আসনেই সিপিএম গোঁজ প্রার্থী দিয়েছে। আরএসপির নির্বাচনী প্রচারপত্রে বলা হয়েছে, রাজ্যের নিচুতলায় ফ্রন্টের কোনও অস্তিত্বই নেই। এই অনৈক্য শুধু গ্রামস্তরেই সীমাবদ্ধ নেই, জেলা পরিষদেও মালদহ, পূর্ব মেদিনীপুরের মতো কয়েকটি জেলায় সিপিএমের সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে রয়েছে সিপিআই।

বাস্তবিক পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে গোটা রাজ্যজুড়ে সিপিএম নজিরবিহীন সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে। টুঁটি টিপে ধরেছে গণতন্ত্রের। কোনও রকম বিরোধিতাকেই সহ্য করতে রাজি নয় তারা। সিপিএম ক্রিমিনাল বাহিনীর হুমকি, মারধর, বাড়ি লুঠ, খুনের জেরে হাজার হাজার আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি বিরোধীরা। বহু আসনে প্রার্থী দিলেও তাদের তুলে নিতে বাধ্য করেছে এই ক্রিমিনালরা। প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় নন্দীগ্রামকে তারা এক নরককুন্ডে পরিণত করেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে বিরোধীদের প্রায় ১৩ জন খুন হয়েছে। শুধু বিরোধীরা নয়, আরএসপি-ফরওয়ার্ড ব্লকের বক্তব্য থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, সিপিএম নেতারা মুখে যতই শরিকি ঐক্যের কথা বলুন, রাজ্যজুড়ে সর্বত্র শরিকদের উপরও একই সন্ত্রাস নেমে এসেছে। কিছুদিন আগেই সিপিএমের ক্রিমিনাল বাইকবাহিনী দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বাসন্তীতে আরএসপি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে হানা দিয়ে নির্বিচারে বাড়ি ও দোকানপাট ভাঙচুর করে, লুটপাঠ চালায়, মহিলাসহ ১৪ জনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। উলুবেড়িয়া এবং বোলপুরেও সিপিএম ক্রিমিনালরা আরএসপি কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক মারধর করে মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দিয়েছে, কোথাও জমা দেওয়া মনোনয়নপত্র তুলে নিতে বাধ্য করেছে। সিপিএমের এই মারাত্মক আক্রমণের সামনে পড়েই আরএসপি নেতা, পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী নন্দীগ্রাম মডেলে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন। সিপিএমের ফ্যাসিস্ট আক্রমণ থেকে এমনকী ফরওয়ার্ড ব্লকের মিছিলও রেহাই পায়নি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দিনহাটায় ১০০ দিনের কাজ, বিপিএল তালিকা প্রকাশ, রেশনে চাল-গম সরবরাহ ইত্যাদি ৭ দফা দাবিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের ডাকা আইনঅমান্যে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে পাঁচ জনকে হত্যা করে। আহত হয় অসংখ্য; আরও বহুজনকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়। সিপিএমের একের পর এক নানা স্বৈরাচারী পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় ফরওয়ার্ড ব্লক পঞ্চায়েত নির্বাচনে একা চলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল।

নির্বাচনে ন্যায্য আসন ভাগাভাগি তো দূরের কথা, সরকারের নীতি নির্ধারণেও শরিকি ঐক্যের ধ্বজাধারী সিপিএম শরিক দলগুলির মতামতের কোনও গুরুত্ব দেয় না— এ অভিযোগ শরিক দলের নেতারা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন। সম্প্রতি শিল্পের নামে কৃষিজমি জবর দখলের প্রশ্নে সিপিএমের এই দাদাগিরির মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যায়। নন্দীগ্রামে পুলিশি সন্ত্রাস নিয়ে শরিকদের বিরোধিতাকে উড়িয়ে দিয়েছে সিপিএম; তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে গরিব কৃষকদের জমিরক্ষার আন্দোলনকে সিপিএম নজিরবিহীন নৃশংসতায় দমন করতে চেয়েছে। সাম্প্রতিক নন্দীগ্রামে সিপিএমের বর্বরোচিত আক্রমণ, রেশন দুর্নীতি এবং রিজওয়ানুরের মৃত্যু নিয়ে সিপিএমের সঙ্গে শরিকদের বিরোধ প্রকটভাবে প্রকাশ্যে এসেছে ঠিকই, কিন্তু ফ্রন্টের এই ঐক্য বাস্তবে কোনও দিনই ছিল না।

সিপিএম নেতারা যত বড় গলা করেই বামফ্রন্টকে সংগ্রামের হাতিয়ার এবং অনেক সংগ্রামের ফল বলে প্রচার করুন এবং সময়ে সময়ে শরিকরা তাতে যতই গলা মেলাক, ইতিহাস তা বলে না। সত্য হল, বামফ্রন্ট গড়ে ওঠার পিছনে কোনও সংগ্রামই ছিল না, ছিল যুক্তফ্রন্টের, তাতে এস ইউ সি আই ছিল। '৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিছক একটি নির্বাচনী জোট হিসাবেই বামফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল। তার আগে সিপিএম নেতারা জনতা পার্টি নেতা প্রফুল্ল সেনের সাথে নির্বাচনী বোঝাপড়া গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে, জনসাধারণের কংগ্রেসবিরোধী তীব্র ক্ষোভ যাতে পুঁজিবাদবিরোধী গণআন্দোলনের পথে প্রবাহিত হতে না পারে, তার জন্য পুঁজিপতিশ্রেণী '৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে রাতারাতি কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে জনতা পার্টিকে খাড়া করে। এবং মার্চ মাসে লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার দু'মাস পরেই জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন হয়। জনতা পার্টি সিপিএম ও তার মিত্রদের এ রাজ্যে তাদের দাবি অনুযায়ী আসন ছাড়তে রাজি না হওয়ায় ভোটে বোঝাপড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপরই সিপিএমের নেতৃত্বে ছ'টি পার্টি কয়েক ঘন্টার বৈঠকে ঘোষণা করে, বামফ্রন্ট তৈরি হয়ে গেছে। এ হেন 'বামফ্রন্ট' কী করে সংগ্রামের ফসল হল তার ব্যাখ্যা সিপিএম নেতারাই দিতে পারবেন।

১৯৭৭-এর আগের ঘটনাই বা কী ছিল? '৭২ সাল থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত, কংগ্রেসী আমলে সিপিএমকে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায়নি, আন্দোলন তো দূরের কথা। এস ইউ সি আই যুক্ত আন্দোলনের প্রস্তাব দিলে জ্যোতি বসু সেদিন বলেছিলেন, আন্দোলন করলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে, কংগ্রেসীরা মারবে, পুলিশ মারবে। বাস্তবে ঐ সময়ে তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তলে তলে সমঝোতা গড়ে তোলার লাইন নিয়েছিলেন। সেই সময়ে বিহার-গুজরাটে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলনে সিপিএম যোগ দেয়নি এই অজুহাতে যে, ওখানে জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেসের মতো দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা আছে। অথচ জরুরি অবস্থার পরপরই অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে যেইমাত্র সিপিএম বুঝল যে, শাসকশ্রেণী এবার জনতা পার্টি নামক জোটকে ক্ষমতায় আনতে চায়, তৎক্ষণাৎ সেই জনসংঘ-সংগঠন কংগ্রেসকে নিয়েতৈরি জনতা পার্টির সঙ্গে মিতালি করে ফেলে সিপিএম। এই ভূমিকার মধ্যে সংগ্রামের ছিটেফোঁটাও আছে কি? এ তো নির্লজ্জ সুবিধাবাদ।

শুধু তাই নয়, তারা যে আন্দোলনের রাস্তা পরিত্যাগ করেছে, পুঁজিপতিদের সে ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে, '৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় বেতার ভাষণে জ্যোতি বসু বললেন, ''এবার আর বামফ্রন্টে এস ইউ সি আই নেই, তাই আন্দোলন, ঘেরাও হবে না।'' এই প্রতিশ্রুতি তিনি কাদের দিয়েছিলেন? জনসাধারণ কি এটা জানতে চেয়েছিল? আসলে বুর্জোয়াশ্রেণীকেই তিনি সেদিন এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বুর্জোয়াদের যারা এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে, তারা কখনও জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার হতে পারে?

বামফ্রন্ট সংগ্রামের হাতিয়ার না সংগ্রাম দমনের? ছবি কী বলে?

বাস্তবে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে গণআন্দোলন দমনের হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে শরিকদের কোনও প্রতিবাদ কোনও দিন শোনা যায়নি। '৭৯ সালের ১৫ জুন মূল্যবৃদ্ধি সহ বামফ্রন্টের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আইয়ের আইনঅমান্য আন্দোলনে সিপিএম সরকার বর্বর পুলিশি অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল। রক্তে সেদিন ভেসে গিয়েছিল এসপ্ল্যানেড ইস্ট। পরবর্তীকালেও মূল্যবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনে বারে বারে এই সরকারের পুলিশ এবং ঠ্যাঙাড়েবাহিনীর অত্যাচার নেমে এসেছে। '৯০ সালে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন কমরেড মাধাই হালদার, গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আরও ৩২ জন কমরেড। এ ছাড়াও শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ যেখানে যতটুকু আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তাকেও সিপিএম সরকার গলা টিপে মারতে চেয়েছে। দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরে আসা উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপিতে লাঠি-গুলি চালিয়ে, ঘরে আগুন দিয়ে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তা নজিরবিহীন। আজকের কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের মতো সেদিন জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় সরকারও নীরব থেকে মরিচঝাঁপি গণহত্যায় মদত দিয়েছিল। তার কোনও প্রতিবাদ সেদিন শরিকরা করেনি।

এবারকার শরিকি বিরোধের মধ্যেও কোনও নীতি-আদর্শ নয়, মানুষের দুর্দশা নিরসনে কোনও আন্দোলন গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও নয়, এ নিছকই ক্ষমতার দখল, ক্ষমতার ভোগ নিয়েই দ্বন্দ্ব। তাই এই দ্বন্দ্বে কোনও নীতির কথা উঠে আসেনি। না হলে যে ফরওয়ার্ড ব্লক সিপিএমের ফ্যাসিস্ট নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে পঞ্চায়েতে একা লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারা মাথা নিচু করে 'ঐক্যে' ফিরে গেল কেন? সিপিএম শরিকদের সঙ্গে চাকর-বাকরের মতো ব্যবহার করে, কোনও মতামতই নেয় না ইত্যাদি অভিযোগ কি তাঁরা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন? নাকি সিপিএম তার দাদাগিরির নীতি, জবরদস্তির নীতি পরিত্যাগ করেছে? তারা কি নন্দীগ্রাম কাণ্ডের জন্য এতটুকুও অনুতাপ প্রকাশ করেছে? নন্দীগ্রামে সিপিএমের নারকীয় গণহত্যা ও গণধর্ষণের প্রতিবাদে যখন গোটা রাজ্য উত্তাল হয়ে উঠেছিল, একের পর এক বন্‌ধ পালিত হচ্ছিল, বুদ্ধিজীবীরা রাস্তায় নেমে এসেছিলেন, তখন মন্ত্রীত্ব ছাড়তে চেয়েছিলেন পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত তিনি রক্ষা করতে পারেননি কেন? সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে শরিক দলগুলির বিশ্বাসযোগ্যতাও আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে।

ক্ষমতায় টিকে থাকতে সিপিএম আজ কোনও গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে আমল না দিয়ে পুলিশ-প্রশাসন, সমাজবিরোধী, কেন্দ্রীয় সরকারের মদতকে একত্রিত করে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে, অপরদিকে ক্ষমতার পাঁকে আটকে যাওয়া শরিকদলগুলির দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে। রাজ্য-রাজনীতির এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে দরকার ছিল, বিশ্বায়নের মারাত্মক আক্রমণ থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে বিশ্বায়নের মূল প্রবক্তা কংগ্রেসের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং কার্যকরী সহায় সিপিএমের বামপন্থী মুখোশ খুলে দিয়ে, জনগণ থেকে তাকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানোর প্রয়োজনে বিকল্প বাম-গণতান্ত্রিক জোট গড়ে তোলা। আমাদের দল ফ্রন্ট শরিকদের কাছে ঐক্যের আবেদনও জানিয়েছিল। অথচ শরিকদলগুলির নেতারা তাতে সাড়া দিলেন না। এই নেতারা একদিকে বলছেন, সিপিএম ক্ষমতায় এলে মৃত্যুর রাস্তা খুলে দেবে, আবার তাঁরা ঐক্যের

চারের পাতায় দেখুন

গণতন্ত্র নয়, পুলিশকে পাশে নিয়ে চলছে সিপিএমের মারতন্ত্র

যেভাবে এ রাজ্যে সপ্তম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাকে কি কোনও সুস্থ গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলা যায়? নির্বাচন মানে ভোটাররা নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে। নির্বাচন মানে প্রার্থী হওয়া যাবে, প্রচার করার সুযোগ থাকবে, নিজের ভোট নিজে দেওয়া যাবে, প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য জবরদস্তি থাকবে না, প্রচারের কাজে বাধা দেওয়া হবে না, একটা পরিচ্ছন্ন ভোটার লিস্ট থাকবে, বুথ ক্যাপচারিং হবে না, রিগিং করা হবে না — এগুলি হল একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ন্যূনতম শর্ত। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এগুলি কি সত্যিই আছে?

গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ মিলে প্রায় তিন হাজার আসনে বিরোধীদের কোনও প্রার্থীই দাঁড় করাতে দেয়নি সিপিএম। হুগলির আরামবাগ, গোঘাট, পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর, গড়বেতা, পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি এবং বর্ধমান, বাঁকুড়া ও উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক সন্ত্রাস কায়েম করে প্রার্থী হতে সিপিএম বাধা দিয়েছে। যাঁরা সাহস করে প্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যাহারে বাধ্য করে জোর গলায় প্রচার করছে — সেন্ট পার্সেন্ট জনগণ তাদের পক্ষে আছে।

এই সন্ত্রাসের এক খণ্ডচিত্র ফুটে উঠেছে সংবাদপত্রের পাতায়। পশ্চিম মেদিনীপুরে 'আগ্রাসী সিপিএম আশঙ্কায় প্রশাসন' — শীর্ষক সংবাদে বলা হয়েছে, 'জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, তথ্যাদি দিয়েই রিপোর্ট পাঠান জেলাশাসক। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩৩০৯টি আসনের মধ্যে ৭৩৬টি আসনে, পঞ্চায়েত সমিতির ৭৫০টি আসনের মধ্যে ১৪১টি ও জেলা পরিষদের ৬২টি আসনের ৫টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে সিপিএম। গড়বেতা-১ ব্লকে তিনটি স্তরের কোথাও প্রার্থী দিতে পারেনি বিরোধীরা। কেশপুর ব্লকে কেবল জেলা পরিষদের দু'টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস। সেই প্রার্থীর জন্য প্রচারে গিয়েছিলেন জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি অনিল শিকারিয়া। অভিযোগ, সেখানে হামলা চালিয়েছে সিপিএম। চন্দ্রকোনা-২ ব্লকে গ্রামপঞ্চায়েতে ৭৩টি আসনের মধ্যে ৭১টিতে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গিয়েছে সিপিএম। ...চন্দ্রকোনা-১ ও গড়বেতা-৩ ব্লকেরও প্রায় অবস্থা একই। ফলে 'গণতান্ত্রিক পরিবেশ' নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে জেলাশাসকের গোপন রিপোর্টে'। 'স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন, বেশি আসন বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যাওয়া গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়' (আনন্দবাজার, ৭-৫-০৮)। আমাদের প্রশ্ন, জেলাশাসক বা স্বরাষ্ট্রসচিব যে আশঙ্কা করছেন, তার মোকাবিলায় তাঁরা কী ভূমিকা নিয়েছেন? প্রশাসন যদি ন্যূনতম নিরপেক্ষতা বজায় রাখত, তাহলে সিপিএমের এই বাড়াবাড়ি অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত থাকত। এই যে গুন্ডাবাহিনী নিয়ে সিপিএম দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিয়েছে? এর দায় প্রশাসন এড়াতে পারে কি ?

ফলে যে সব এলাকায় সিপিএম বন্দুকের নলের ডগায় বিরোধীদের দাঁড়াতে না দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েতের ক্ষমতা কব্জা করল, তারা আসলে ঐসব এলাকার লক্ষ লক্ষ জনগণের ভোট দেওয়ার অধিকার হরণ করল। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর, শুভকর হয় কীভাবে? ফলে এ জিনিস আটকাতে না পারলে এ পথ বেয়েই তো আসবে পুরোপুরি ফ্যাসিবাদ এবং সিপিএমের মাধ্যমে তা আসতে শুরু করেছে।

নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে সিপিএম কৌশল নিয়েছে গোলাগুলি চালিয়ে, বোমাবাজি করে, প্রাণে মারার পরিবর্তে চিরজীবনের মতো পঙ্গু করে দিয়ে, মহিলাদের শ্লীলতাহানি-ধর্ষণ করে, মালতি জানার মতো মহিলাদের শাড়ি খুলে নিয়ে বিবস্ত্র অবস্থায় প্রায় এক কিলোমিটার দৌড় করিয়ে গোটা এলাকা সন্ত্রস্ত করে দিয়ে ভোটারদের গ্রামছাড়া করে ব্যাপক ছাপ্পা মেরে নির্বাচনে জেতা। কে বলবে, এটা গণতন্ত্র? সিপিএমের এই যে সন্ত্রাসের রাজত্ব পশ্চিমবঙ্গে কায়েম হয়েছে, ৬ মার্চ একটি টিভি চ্যানেল ফ্ল্যাশ দিচ্ছিল এই বলে যে, পশ্চিমবঙ্গে আসলে 'মারতন্ত্র' চলছে। একটি পত্রিকা ঐদিন নন্দীগ্রামের রিপোর্ট করেছে এভাবে — মার, মার এবং শুধু মার — এই হল নন্দীগ্রামের নির্বাচন পরিস্থিতি। সিপিএমের যে নেতারা বলেন, '৭২-এর কংগ্রেসী সন্ত্রাস — ১১০০ কর্মীর মৃত্যু হচ্ছে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস। তাঁরা চোখের ঠুলি খুলে নিজেদের মুখটা দেখলে দেখতে পেতেন, আধা-ফ্যাসিস্ট এখন পুরো ফ্যাসিস্ট হতে চলেছে। ফলে কংগ্রেসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম করে আজ যাঁরা জীবন সায়াহ্নে উপনীত, সেই বামপন্থী চেতনার মানুষেরাও সিপিএমের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কার্যকরী শক্তি হিসাবে এস ইউ সি আই ও তৃণমূল কংগ্রেস জোটকে স্বাগত জানাচ্ছেন এই কারণেই। নবীন প্রজন্ম তো স্বাগত জানাচ্ছেনই। কারণ তাঁরা জন্মেই দেখেছেন সিপিএমের চণ্ডমূর্তি। এদের অত্যাচার থেকে বাঁচতেই এবং এই রাজ্যকে বাঁচাতে, অবমাননা থেকে মানবতাকে রক্ষা করতে এই দুই শক্তির মিলন তাই ঐতিহাসিক প্রয়োজন। যুক্ত গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই শক্তি শুভ ফলাফলকে নিশ্চিত করবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক এবং নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করতে রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের কোনও উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে না। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব সুধীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী পরিষ্কারভাবে বলেছেন, কমিশন বড়জোর কিছু সুপারিশ করতে পারে, কিন্তু সেই সুপারিশ মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রাজ্য সরকারের নেই। ফলে সিপিএম সন্ত্রাস চালালেও কমিশন কিছু করবে না। তাহলে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব কী? রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব যদি হয় সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা, তাহলে নির্বাচনে বন্দুকবাজি- বোমাবাজি রুখতে, বুথ ক্যাপচারিং- ছাপ্পা মারা রুখতে, ব্যালট বাক্স কেড়ে নেওয়া রুখতে, কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাবার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে আর্জি জানাতে পারে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সেটা করছে না কেন? নির্বাচন কমিশন গোটা নির্বাচন পর্বটিকেই যদি গুন্ডাদের হাতে ছেড়ে দেয়, তাহলে জনগণের ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই কমিশন পোষার কী দরকার? নির্বাচন কমিশনের কাজ যদি হয় গুন্ডাবাজি করে যারা জিতে আসবে তাদের বৈধতার ছাপ দেওয়া, তাহলে এই নির্বাচন কমিশনের প্রতি মানুষ আস্থা ধরে রাখবে কী করে?

গুন্ডাবাজি করে যারা পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় আসবে, তারা কি জনগণের উন্নয়নের জন্য কাজকর্ম করতে পারে? পঞ্চায়েতকে সিপিএম পাঁচ বছর ধরে সন্ত্রাস কায়েমের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। গ্রামীণ মানুষের নানা ক্ষোভ-বিক্ষোভ, দাবি-দাওয়ার আন্দোলনকে রক্তচক্ষু দেখানো থেকে শুরু করে নানা কায়দায় দমনের হাতিয়ার হিসাবে পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করছে সিপিএম। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্কিমের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে তারা। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ এই চক্রেরই 'উন্নয়ন' ঘটছে। কিছু গরিব মানুষকে এই দুর্নীতির চক্রের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

সিপিএম বলছে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নাকি রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। কী উন্নতি হয়েছে? কার উন্নতি হয়েছে? ১৯৭৭ সালে সিপিএম ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার সময় রাজ্যে খেতমজুর ছিল ৩২ লক্ষ ৭০ হাজার, ২০০১-এ তা হয়েছে ৭৩ লক্ষ ২৬ হাজার। এখন এই সংখ্যা প্রায় কোটির কাছাকাছি। কৃষক জমি হারিয়ে খেতমজুর হলে তাকে কি উন্নয়ন বলে? আসলে সিপিএম এখন টাটা-বিড়লা-জিন্দাল-আম্বানিদের উন্নয়ন দেখতেই অভ্যস্ত। ওরা রাজ্যের এমন উন্নয়ন ঘটিয়েছে যে, আয়ুশ মুখার্জীর মতো একটা অল্পবয়সী শিশুর ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে। ওরা এমন উন্নয়ন ঘটিয়েছে যে, স্বামীর কিডনির চিকিৎসা করার জন্য এক মা তার সদ্যোজাত সন্তানকে বিক্রি করতে হাসপাতালের দ্বারস্থ হয়েছে। ওরা এমন উন্নয়ন ঘটিয়েছে যে গ্রামাঞ্চলে শতকরা ২০ জন লোকের দৈনিক ১২ টাকা খরচ করারও ক্ষমতা নেই (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, ৩২ রাউন্ডের রিপোর্ট)।

একটা বুর্জোয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গ্রামস্তরের প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বুর্জোয়া শোষণের বাইরে কিছু দিতে পারে না — এই জিনিসটি মনে রাখা দরকার। ফলে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমে গরিবের প্রকৃত উন্নয়ন হতে পারে না। পঞ্চায়েতের টাকা আত্মসাৎ করে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের উন্নয়ন হতে পারে এবং তারা লুটে খাওয়ার জন্য বারবার গুন্ডাবাজি করে পঞ্চায়েতে অন্যদের জেতা বন্ধ করতে পারে — যা আজ সিপিএম করছে। এই অবস্থায় পঞ্চায়েতকে সামান্য হলেও জনস্বার্থে কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন গ্রামে গ্রামে গণকমিটি গড়ে তোলা, ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা — যে বাহিনী বুথ দখল আটকাবে, বিজয়ী প্রার্থী জনগণের টাকা পকেটস্থ করছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত হলে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলবে।

নির্বাচন আসতেই সিপিএম নেতার মুখে শ্রেণীতত্ত্বের বুলি

'শুধু উন্নয়ন নয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাতিয়ার করুন শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি কেও'' — একথা বলেছেন বামফ্রন্টের শিল্পমন্ত্রী তথা সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য নিরূপম সেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে বালুরঘাটের কর্মীসভায় সিপিএম নেতার মুখে হঠাৎ শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির কথা কেন? পুঁজিপতিদের 'শিল্পবন্ধু' হিসেবে খ্যাত সিপিএম নেতামন্ত্রীরা তো এতদিন উন্নয়নেরই ঢাক পিটিয়েছেন। তাঁরা সিঙ্গুরের মানুষের উন্নয়ন করতে চেয়েছেন, নন্দীগ্রামের মানুষের উন্নয়ন করতে চেয়েছেন। তাদের উন্নয়নের বলি হয়েছে তাপসী মালিক, রাজকুমার ভুল। উন্নয়নের নিঃস্বার্থ কারিগর সিপিএম নন্দীগ্রামের মানুষকে সবক শেখাতে ২০০৬-এর জানুয়ারি থেকে লাগাতার পুলিশ-ক্রিমিনাল বাহিনীর নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। গত বছর ৭ জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত কমপক্ষে ২৫ জন প্রাণ দিয়েছেন নন্দীগ্রামে। তাদের উন্নয়ন বাহিনীর তাণ্ডবে নন্দীগ্রামে মা-বোনেদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত। তাদের উন্নয়নের মন্ত্র আতঙ্কের সমতুল্য।

এই উন্নয়নের ধ্বজাধারীদের মুখে হঠাৎ শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির তত্ত্ব কেন? উন্নয়নের প্রচারে কি মানুষ আর ভুলছে না? নাকি সিপিএম নেতারাও বুঝে গেছেন, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মানুষকে প্রতারিত করতে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখালেও তা বাস্তবে সম্ভব হচ্ছে না? তাই নতুন করে 'শ্রেণীতত্ত্ব' তুলে আবার মানুষকে প্রতারিত করার খেলায় নেমেছেন তারা। গ্রামবাংলার শোষিত নিপীড়িত জনগণ আজও মনে প্রাণে নিজেদের শ্রমিকশ্রেণীর মানুষ বলেই মনে করে। তাই উন্নয়নের দাবিদার সিপিএম সরকার উন্নয়নের স্বপ্ন ফেরি করে বেড়ালেও আজ তাদের ভোটবাক্সের খাতিরে শ্রেণীতত্ত্বের কথা বলতে হচ্ছে। কারণ পুঁজিপতিশ্রেণী অর্থ দিলেও নির্বাচনে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের ভোটের কথা ভেবেই আজও শ্রেণীতত্ত্ব আওড়াতে হয় নেতাদের।

যদিও সিঙ্গুরে, নন্দীগ্রামে কোন্ শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন্ শ্রেণী লড়াই করছে, এবং সেখানে সিপিএমের অবস্থান কোন্ শ্রেণীর পক্ষে, তা আজ পরিষ্কার। টাটা-সালেমের বন্ধু সেজে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ যে রক্ষা করা যায় না একথা বোঝার জন্য মার্কসবাদী হওয়ার দরকার নেই। মালিকশ্রেণীর আশীর্বাদধন্য হয়ে গত ৩০ বছর শাসন করছে যে সিপিএম, সে কার স্বার্থ রক্ষা করছে তা মর্মে মর্মে মানুষ উপলব্ধি করছেন। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিগত বিচারে যে সিপিএমের অবস্থান মালিকশ্রেণীর ও কায়েমি স্বার্থবাদীদের পক্ষে, তারা শ্রমিকের বন্ধু সেজে ভোট চাইছে। এদের স্বরূপ চিনে নিয়ে নির্বাচনে পরাস্ত করাই হবে রাজ্যের শ্রমিক-কৃষকের কর্তব্য।

সুবিধাবাদের গর্ভ থেকেই বামফ্রন্টের জন্ম

তিনের পাতার পর

নাম করে ঘুরে-ফিরে সেই ফ্রন্টেই গিয়ে ঢুকছেন। বাস্তবে রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষের চরম দুরবস্থা, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, অনাহার, অপরদিকে সাধারণ মানুষ সহ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপর সিপিএমের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস — এর কোনও কিছুই বোধহয় শরিক দলগুলির নেতাদের আজ আর সত্যিকারের অর্থে ভাবায় না, ক্ষমতার কাছে সবই তুচ্ছ হয়ে গেছে। তাই ফ্রন্ট আঁকড়ে থেকে জনসাধারণের উপর একদিকে সিপিএমের ফ্যাসিস্টসুলভ সন্ত্রাস, অপরদিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শোষণ-অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে যেতেই সাহায্য করে যাচ্ছেন। কিন্তু এইভাবে অত্যাচারীর সঙ্গে আপস করে, তাদের প্রসাদলাভ করে আত্মরক্ষা করা যায় কি? শরিক দলের নীচের তলার যে সব কর্মীরা সিপিএমের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছেন, তাঁরা ভেবে দেখবেন।

বাস্তবে বামফ্রন্টের বামপন্থাও নেই, ঐক্যও নেই। রয়েছে সিপিএমের স্বৈরাচার মেনে নিয়ে শরিকদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। এই ঐক্য মানে শাসকদের ঐক্য, কায়েমী স্বার্থের ঐক্য, গ্রামাঞ্চলে কায়েমী স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার, চুরি-দুর্নীতি-স্বজনপোষণকে টিকিয়ে রাখার ঐক্য, বিরোধীদের উপর নির্বিচারে খুন-সন্ত্রাস চালিয়ে যাওয়ার ঐক্য। এই ঐক্য কোনও জনগণের ঐক্য নয়, এর সাথে জনস্বার্থেরও কোনও সম্পর্ক নেই। সত্যিকারের ঐক্য আজ গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে শোষিত জনসাধারণকেই গড়ে তুলতে হবে; পরাস্ত করতে হবে এই শাসকজোটকে, সাথে সাথে জনসাধারণের সামনে ফাঁস করে দিতে হবে কংগ্রেস-বিজেপির প্রতারণার রাজনীতিকে। তার জন্য প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক লাইনে উপযুক্ত নেতৃত্বে জনগণের সার্বিক ঐক্য।

ক্রিকেট

চিয়ার লিডার্স আমদানি বিকৃত রুচিরই প্রকাশ

বর্তমানে ভারতবর্ষ তথা কলকাতা মহানগরীতে পরিকল্পিতভাবে বাণিজ্যিক স্বার্থে এক ধরনের ক্রিকেট জ্বর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অতীতে ক্রিকেট খেলা ফুটবলের মতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত ধরে এদেশে এলেও বর্তমানে এই টি-২০ বা আইপিএল যে চটকদার চিত্তবিভ্রমকারী বাণিজ্যিক মোড়কে ক্রিকেটকে পরিবেশন করছে, তা অতীতের টেস্ট ক্রিকেট থেকে গুণগতভাবে আলাদা। বর্তমানে এই টি-২০ বা আইপিএল লিগে অন্যতম আকর্ষণ বোম্বাই সিনেমার মহাতারকারদের উপস্থিতি এবং তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে 'চিয়ার লিডার' বা 'চিয়ার গার্লদের নাচ', এমনকী যা খেলার আকর্ষণকেও অতিক্রম করে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে কিছু বিতর্ক শুরু হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকার এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করায় বিতর্কটি চূড়ান্ত মাত্রা পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বিদগ্ধ মহল, অর্থাৎ সাহিত্যিক, ক্রীড়াবিদ, মঞ্চ ও রূপালী পর্দার কুশীলব, এমনকী নামীদামী রাজনৈতিক নেতারাও এ নিয়ে তর্কযুদ্ধে নেমেছেন। এই তথাকথিত বিনোদন বা নাচের যাঁরা সমর্থক, তাঁরা বলছেন, সিনেমায় একদল লোক এসব দেখতে ভালবাসেন, কিন্তু প্রকাশ্যে হলেই রে রে করে ওঠেন। এটা ভণ্ডামি। কেউ বলছেন, ক্রিকেট ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল না, তাকে যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি, তবে এই 'চিয়ার লিডার' সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বাধা কোথায়? কারোর কারোর মতে নগ্ন দেহ প্রদর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে তাঁরা খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রে নরনারীর মিলন দৃশ্যের ভাস্কর্যের উল্লেখ করে এই প্রায় বসনহীন চিয়ার লিডারদের দেহ প্রদর্শনকে সমর্থন করেছেন। এদেশে সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা আনন্দবাজার বলেছে, ''....বস্তুত ভারতীয় সংস্কৃতি অনেক বেশি খোলামেলা, সৎ, প্রতারণা বর্জিত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য, মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য, দেওয়াল চিত্রের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা — সর্বত্রই মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রকাশগুলিকে সানন্দে উদ্‌যাপন করা হইয়াছে, নৈতিকতার ঘোমটা পরাইয়া নিষেধের বলয় রচনা করা হয় নাই। সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে ইদানীং কট্টরপন্থীরা যাহা প্রচার করেন, তাহা আসলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সূত্রে প্রাপ্ত এবং আত্তীকৃত ভিক্টোরীয় গোঁড়ামি, যাহা শরীর এবং যৌনতা সম্পর্কে স্পর্শকাতর কুসংস্কারে ভুগিয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজ মার্কা এই বাসনা আদতে কোন ভারতীয় মানসিকতা নয়, সনাতন তো নয়ই'' (সম্পাদকীয়, ২৬ এপ্রিল)।

পরিশেষে আনন্দবাজার উপদেশ দিয়েছে, ''উল্লাস বালিকাদের লাস্যনৃত্য চলুক। যাঁহাদের তাহা সহ্য হইতেছে না তাঁহারা মাঠের অন্যদিকে তাকাইয়া থাকুন, টিভির সামনে বসিলে চোখ বন্ধ করিয়া ফেলুন'' (ঐ)।

সি পি আই (এম) পলিটব্যুরো সদস্য এবং দলের একজন প্রধান মুখপাত্র হিসাবে সীতারাম ইয়েচুরির বক্তব্য — বিশ্বায়নের পথ ধরে যখন শিল্পে বিনিয়োগ হচ্ছে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে এ সংস্কৃতি আসবে। এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। আর বৈদেশিক বিনিয়োগকে যখন মেনে নিয়েছি, তখন একে মেনে নিতে হবে।

কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী বলেছেন, ''ভারতীয় বা বাংলা সংস্কৃতি এত ঠুনকো নয় যে, এক রাত্তিরের নাচে ভেঙে পড়বে।''

এরকম আরও নানা মত এ সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে যে বিষয়টি আলোচ্য, তা হল, বর্তমানে ভারতবর্ষে ক্রিকেট নিয়ে এই উন্মাদনা এবং তার বিনোদনের নাম করে এই ধরনের অর্দ্ধনগ্ন নারীদের প্রদর্শন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বোঝা দরকার, সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝি। সর্বহারার মহান নেতা, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ''মানুষের মননশীলতার সামগ্রিক ও সুন্দরতম প্রকাশ হল তার সংস্কৃতি।'' অর্থাৎ মানুষ ভাবজগতে যা কিছু উৎপাদন করে তাই সংস্কৃতি নয়, তার সুন্দরতম অংশই সংস্কৃতি। আমরা জানি, সমাজ পরিবর্তনে আর্থব্যবস্থার পরিবর্তন হয় ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডল পাল্টায় — ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, শ্লীল-অশ্লীল, সব কিছুর ধারণা পাল্টায়। পাল্টায় এই জন্য যে, নতুন সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে পুরনো সমাজের ধারণাগুলি সঙ্গতিহীন হয়ে পড়ে। তাই একদিন যা শিল্পসম্মত বা স্বাভাবিক ছিল, তা পরবর্তীকালে অস্বাভাবিক বা অসুন্দর হয়ে পড়ে। আবার একটি বিশেষ দেশের বিশেষ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক, তা অন্য দেশ বা ভিন্ন সামাজিক পরিমণ্ডলে অস্বাভাবিক, বিসদৃশ। তাই অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর লোকাচার, তাদের বেশভূষা বা তারা যে পোশাকে তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে, তা সর্বত্র শোভনীয় হয় না। হলে তা অত্যন্ত বিসদৃশ রুচিহীন হবে। আন্দামানের জারোয়ারা নগ্ন থাকে, আফ্রিকার অনেক আদিবাসী কেবলমাত্র কটিদেশ আবৃত রাখে। কিন্তু তাকে উল্লেখ করে কেউ যদি এটা আধুনিক জাতির বা মানব সমাজের সংস্কৃতির অঙ্গ বলে মনে করে, তাহলে তাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। আবার প্রতিটি যুগের মহান শিল্পীরা তাঁদের চিত্রে-ভাস্কর্যে সাধারণ মানুষের ভাবনা বাসনা এমন শৈলীতে উদ্ভাসিত করেছেন, যা একাধারে সেই সেই যুগের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ ও শৈল্পিক সুষমামণ্ডিত হয়ে এক অসাধারণ রূপ পেয়েছে। এমনই আমরা দেখি রেনেসাঁসে অসাধারণ ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিডের রূপায়ণে। সম্পূর্ণ নিরাবরণ অপূর্ব সুষমামণ্ডিত পুরুষমূর্তি। খাজুরাহোর ভাস্কর্যও এরকমই এক প্রতীকী রূপায়ণ, এক অসাধারণ শিল্পকীর্তি। কিন্তু তাই বলে কি আজ কোনও অলিম্পিক-এ ডেভিডের মত নগ্ন পুরুষরা 'চিয়ার বয়' হিসাবে নাচতে থাকলে তাকে কেউ সুস্থতা বলবে? তাই কোনারক, খাজুরাহোর নরনারীর শিল্পরূপ সমকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মন্দির গাত্রে সুন্দর, প্রকাশ্যে জনজীবনে নয়।

সুতরাং সনাতন ভারতবর্ষে প্রাচীন সাহিত্য শিল্পে কি ছিল তার দোহাই পেড়ে বর্তমান অবক্ষয়ী সংস্কৃতিকে সমর্থন করা এক ধরনের মূর্খতা।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সবকিছু পুঁজিবাদী বাজারের পণ্য

বহুপূর্বে মার্কস দেখিয়েছিলেন যে, পুঁজিবাদী সমাজে সবকিছুই পণ্য এবং অর্থের বিনিময়েই তার মূল্য নির্ধারিত হয়, তা কায়িক শ্রমই হোক, মানসিক শ্রমই হোক, বা মানবিক সম্পর্কই হোক — সবকিছুরই মাপকাঠি অর্থ। তিনি লিখেছিলেন, "It has left no other bond between man and man, but crude self-interest and unfeeling 'cash payment'… It has degraded personal dignity to level of exchange value; and in place of countless dearly brought chartered freedoms, it has setup one solitary unscrupulous freedom — freedom of trade'' (Communist manifesto). মার্কসের এই অসাধারণ প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণ, যা তিনি বুর্জোয়া সভ্যতার যৌবনকালে করেছিলেন, বর্তমানে অবক্ষয়ী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত নির্মম এবং সর্বব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। যে খেলাধূলা মানুষের শরীরচর্চা ও মানসিক সুস্থ বিনোদনের অঙ্গ ছিল, তা বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বহুলপ্রচারিত পণ্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেটের চালচিত্র দেখলেই এটা পরিষ্কার হবে। যদিও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরেই ফুটবল-ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা ভারতবর্ষে এসেছিল, কিন্তু ক্রিকেট বরাবরই আপামর জনসাধারণের নাগালের বাইরে ছিল। এ ছিল ব্যয়বহুল। তাই এদেশে রাজা-মহারাজা, ধনী ব্যক্তিরাই ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক বা অংশগ্রহণকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্রিকেট বা অন্য কোনও খেলাধূলায় অংশগ্রহণকারীরা এ থেকে ব্যবসা করার কথা চিন্তা করতে পারত না। কিন্তু বিগত এক দশক ধরে বিশেষত বিশ্বায়ন ও নয়া উদার অর্থনীতির হাত ধরে ক্রিকেটে বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলি অর্থ লগ্নী করতে শুরু করে। কারণ তারা হিসাব করে দেখেছে, ভারতের জনসংখ্যার ১০ থেকে ১২ শতাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বিশ্বের উন্নত দেশগুলির মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সমান এবং এই ১২ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ১৫ কোটি মানুষ যারা যেকোনও বিলাসদ্রব্য বা বিনোদনের ক্রেতা হতে পারে। তাই ভারতবর্ষ হয়ে পড়ল ক্রিকেট নামক শিল্প ও তার লগ্নীর বৃহত্তম বাজার। এই পথ ধরেই ক্রিকেটের উজ্জ্বল নক্ষত্ররা হয়ে পড়ল এক এক সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার। অর্থাৎ ক্রিকেট তারকারা আর দেশের প্রতিনিধি রইল না, হয়ে পড়ল বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থার প্রচারক। পোশাকে সংস্থার লোগো শোভিত হয়ে তাঁরা তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে লাগলেন। এক একজন ক্রিকেট নক্ষত্র এক লাফে কয়েক কোটি ডলারের মালিক হয়ে পড়লেন। পুঁজিপতিরা তাদের পণ্য বিক্রির জন্য প্রচার করে, বিজ্ঞাপন দেয় — সুদৃশ্য মোড়ক দিয়ে এবং নানা ধরনের বিজ্ঞাপনী কৃৎকৌশলে পণ্যকে জনমানসে আকর্ষণীয় করে। আর এটা করতে গিয়ে সকল প্রকার রুচি, নৈতিকতা বা শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে যায়। পুরুষের দাড়ি কামানোর ব্লেড থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রসাধনী দ্রব্যে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নারীদেহের অবাধ প্রদর্শন আজ একটি সাধারণ ঘটনা। বর্তমানে ক্রিকেট যেহেতু অতি লাভজনক পণ্য (পুঁজিবাদে প্রায় সব খেলাই এখন তাই), তাই এদেশের বৃহৎ শিল্পপতি এবং কোটিপতি চিত্রতারকারা এই পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আর আজকের শিল্পের চরিত্র যেমন দীর্ঘস্থায়ী পণ্য উৎপাদন করা নয়, তা 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো' নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় — তাই টেস্ট ক্রিকেটও তার মর্যাদা ও মান হারিয়ে একদিনের ক্রিকেটে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তাতেও বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি, যারা অনেকেই এখানে বিনিয়োগ করতে চায়, তাদের পরিসর বা পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না পাওয়ার ফলে এসেছে এই সীমিত টি-২০ খেলা। এদেশের অনেকগুলি বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী রাতারাতি এক-একটি ক্লাব তৈরি করে তার মালিক হয়ে বসল। মালিক হলেন কোটিপতি চিত্রতারকারাও। ব্যস পণ্য তৈরি, এবার চাই উপযুক্ত বাজার অন্বেষণ এবং তার জন্য প্রচার। বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত গণমাধ্যমগুলি এর প্রচারের জন্য উঠে পড়ে লাগল। কোন্ খেলায় কোন্ শিল্পপতি, কোন্ কোন্ চিত্রতারকারা আসবেন, তার প্রচারই মুখ্য হয়ে উঠল। আর তার নবতম সংযোজন হল, চিয়ার লিডার বা স্বল্পবসনা রমণীদের অশালীন দেহ-বিভঙ্গের প্রদর্শন। আর এই পুরো বিষয়টি গণমাধ্যমগুলি এমনভাবে প্রচার করতে লাগল, যেন এটাই আজকে দেশের কোটি কোটি বুভুক্ষু, অর্ধাহারে থাকা কর্মহীন মানুষের একমাত্র সমস্যা। ইডেনের ঝলমলে বর্ণছটায় ভুলিয়ে দিতে চাইল ঝুপড়িতে থাকা অসহায় মানুষ, অথবা গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী কিছু না পাওয়া মানুষের আর্তি — যেখানে জমে আছে জমাট অশ্রু ও নিঃসীম অন্ধকার।

বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও গণমাধ্যমগুলি যতই প্রচার করতে থাকল, ততই একদল মানুষের মধ্যে এ ধরনের উন্মাদনা জন্ম নিতে থাকল। এই উন্মাদনাই ক্রিকেট পণ্যের মূল অবলম্বন। যাঁরা যুক্তি করছেন, এটা বিনোদন, তাঁদের কাছে প্রশ্ন, কার বিনোদন? সুস্থ সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের বিনোদন? না, অসুস্থ বিকৃত মানসিকতার উদ্ভেজক উস্কানি? যুক্তি করা হচ্ছে, হিন্দি সিনেমায় এ ধরনের নাচ হয়, তাই এর বিরোধিতা করা ভণ্ডামি। হিন্দি সিনেমায় যা হয়, তা কি সুস্থতার প্রতীক? এসব আসলে শয়তানের যুক্তি। দ্বিতীয়ত, পুরুষশাসিত সমাজের সংস্কৃতিকে অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ এক নবরূপে রূপায়িত করেছে। সামন্ততন্ত্রে নারী অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনবতী ছিল। তার মুক্তির প্রয়োজন ছিল বুর্জোয়া বিপ্লবেরই প্রয়োজনে। কিন্তু বুর্জোয়াকথিত এই নারীমুক্তি নারীকেও পুঁজিবাদী বাজারের পণ্যে পরিণত করেছে, নারীদেহকে বিজ্ঞাপন ও তথাকথিত বিনোদনের অঙ্গ করেছে। নারীত্বের এই অবমাননা মনুষ্যত্ব সম্পন্ন পুরুষকেও অবমানিত করবে। মার্কস-এঙ্গেলস বুর্জোয়া সভ্যতার এই দিকটিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'The debasement of the female sex is an essential character trait of civilization no less than of barbarianism, with this difference, that under civilisation all the vices which barbarism practices in a simple and straight forward way, are now preserved in a complicated, ambiguous and typocritical semblance … When woman is kept enslaved man suffers from this even more than woman herself'' (Marx-Engles – Holy family)

এই অবমানিত লাঞ্ছিত নারীত্বকে পণ্য করা হ'ল ক্রিকেটের তথাকথিত বিনোদনের স্বার্থে। এ কেবল নারীত্বের অবমাননা নয়, যথার্থ পৌরুষের অবমাননা, মনুষ্যত্বের অবমাননা। আর যাঁরা মনুষ্যত্বকে, নারীদেহকে পণ্য করার সপক্ষে ওকালতি করছেন, বলছেন, 'উল্লাস বালিকাদের নৃত্য চলুক। যাহাদের তাহা সহ্য হইতেছে না, তাহারা মাঠের অন্যদিকে তাকাইয়া থাকুন' — তাঁদের উদ্দেশে বলি, নারীকে বা নারীদেহকে পণ্য করার বীভৎস মজায় যাঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা মার্কস-এঙ্গেলসের ভাষায় বর্বর জাতির রকমফের ছাড়া আর কিছুই নয়। বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্র-শরৎ সংস্কৃতির স্রোতধারা বিধৌত এই দেশ, এই বঙ্গভূমি একে বরদাস্ত করবে না। কুৎসিত পণ্য সংস্কৃতির অবসানের জন্য মানুষ রুখে দাঁড়াবেই। সেদিন বেশি দূরে নয়।

রাজ্যে রাজ্যে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

দিল্লি

এস ইউ সি আই দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে দলের ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ২৪ এপ্রিল গান্ধী পিস ফাউন্ডেশনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড প্রাণ শর্মা। সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এই সমস্যা দূর করার জন্য সরকারের উচিত সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাইকারি এবং খুচরো ব্যবসা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা করা এবং সুলভ মূল্যে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণকে সরবরাহ করা। এর মধ্য দিয়ে সারা দেশে হাজার হাজার খুচরো দোকানে শুধু বেকারদের চাকরি দেওয়াই সম্ভব হবে না, এর মধ্য দিয়ে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবসায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যবর্তী কালোবাজারি এবং মজুতদারির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, যারা জিনিসপত্রের দাম বাড়ায় তাদের ভূমিকা অবলুপ্ত করা যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এস ইউ সি আই'র বোঝাপড়া সম্পর্কে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, জনগণের কণ্ঠরোধ করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ফ্যাসিস্ট কায়দায় দমনপীড়ন চালাচ্ছে তা মোকাবিলা করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা করতে একটি শ্রমিকশ্রেণীর দলের কর্তব্য হল, ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা। এই লক্ষ্য থেকে যেসব রাজনৈতিক দল ও শক্তি লড়তে চায়, তাদের ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি বলেন, সরকারি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পুঁজিপতিশ্রেণীর আস্থা অর্জন করতে মার্কসবাদের নাম নিয়ে চলা একটি দল বিশ্বায়নের নীতি এবং সেজ প্রকল্প রূপায়নের জন্য যেভাবে সাধারণ মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে, তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, সিপিএম-সিপিআইয়ের মতো পার্টিগুলো বামপন্থার আলখাল্লা পরে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ট শক্তির মতো আচরণ করছে, যার চরিত্র আজ উদ্‌ঘাটিত করা দরকার। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আমাদের পার্টি এস ইউ সি আই একদিকে পুঁজিপতিশ্রেণীর অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দল জাতীয় কংগ্রেস এবং বিজেপির বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে সিপিএম-এর মতো মেকি বামপন্থী শক্তির জনস্বার্থবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে যারা, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে জনগণের সমস্যাগুলি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পথ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এই বোঝাপড়া পার্টির যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার মূল নীতি এবং প্রচেষ্টার বাস্তবায়ন।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী ছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

কর্নাটক

এস ইউ সি আই-এর ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ৩০ এপ্রিল বাঙ্গালোরে এক সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, বিশ্বায়ন নীতির ফলে বেকারি বাড়ছে মারাত্মক হারে, বাড়ছে আর্থিক বৈষম্য। অথচ বিশ্বের প্রথম দশজন ধনী ব্যক্তির মধ্যে চারজনই ভারতীয়। দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা প্রতিবছরই ভীষণভাবে বেড়ে চলেছে, শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বিশ্বায়নের ছাঁচে ঢালা হচ্ছে। সরকারি 'সেজ' নীতির সর্বনাশা দিকগুলি তুলে ধরে তিনি বলেন, পুঁজিপতিশ্রেণীর দল কংগ্রেস, বিজেপির মতো, তথাকথিত মার্কসবাদী দল সিপিএম-সিপিআই-ও এই নীতিকে নির্মমভাবে কার্যকর করছে। এই পরিস্থিতিতে উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে সঠিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলে বিপ্লবের মাধ্যমে এই শোষণমূলক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার কাজে জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

মধ্য প্রদেশ

দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৭ এপ্রিল ভোপালের নীলম পার্কে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যস্তরের এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন দলের হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান, সভাপতিত্ব করেন দলের ভোপাল কমিটির কমরেড জে সি বারই। রাজ্য নেতা কমরেড উমাপ্রসাদও বক্তব্য রাখেন।

কমরেড সত্যবান বলেন, নির্বাচনের প্রাক্কালে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নানা জনমোহিনী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি কমানো, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, আউট সোর্সিং বন্ধ করা, সস্তায় বীজ সার সরবরাহ, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে তারা নীরব। জনজীবনের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি জনগণের কাছে আহ্বান জানান।

২৮ এপ্রিল সাগরে দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। দেশের অভ্যন্তরে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন — আমাদের দল দীর্ঘদিন ধরেই খাদ্যদ্রব্যে পাইকারি ও খুচরো স্তরে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্যে সর্বত্র, সব ধরনের সরকারই, যারা বিরাট অঙ্কের কেনাবেচার খুচরো বাজার বৃহৎ পুঁজির হাতে ছেড়ে দিচ্ছে, তারা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দাবি কোনদিনই মেনে নেয়নি। খুচরো ব্যবসা বৃহৎ পুঁজির হাতে তুলে দিলে দেশে আনুমানিক দশ লক্ষ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং তার সঙ্গে যুক্ত চার কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হবে।

তিনি বলেন — যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে ততদিনই তার উপসর্গ হিসাবে কালোবাজারি-ফাটকাবাজি থাকবে এ কথা ঠিক। তবে তা সত্ত্বেও একমাত্র গণআন্দোলনের চাপেই সরকারকে বাধ্য করা যায় জনস্বার্থে কিছু পদক্ষেপ নিতে। সর্বশেষে তিনি পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এস ইউ সি আই মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের কনভেনর কমরেড উমাপ্রসাদ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড রামঅবতার শর্মা।

এছাড়াও মধ্যপ্রদেশের গুণা জেলায় ও গোয়ালিয়রে পার্টি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়।

বিহার

এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবস ২৪শে এপ্রিল যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হল পাটনা শহরে। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর এবং প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি। তিনি বলেন, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা দ্রুতগতিতে কমছে, বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম, বেকারি, ছাঁটাই। শিল্পায়নের নামে কৃষকের জমি ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, দ্রুত অধঃপতিত হচ্ছে নৈতিক-সাংস্কৃতিক মান। এই শ্বাসরোধকারী অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেতে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে।

কমরেড শিবশঙ্কর বলেন, জাত-পাত, আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতার বিষ জনগণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদীদের জুনিয়ার পার্টনার হয়ে চরম জনবিরোধী বিশ্বায়নের নীতিকে কার্যকর করছে এবং সে ব্যাপারে সহযোগিতা করে চলেছে তথাকথিত মার্কসবাদী সিপিএম। সঠিক নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তুলে এই জনবিরোধী নীতিসমূহ ও দলগুলিকে পরাস্ত করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

রাজস্থান

২৭ এপ্রিল জয়পুরের সর্বোদয় ভবনে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড প্রতাপ সামল। তিনি ছাড়াও রাজস্থান পার্টি ইনচার্জ কমরেড গিরিজেশ্বর প্রসাদ, কমরেড রাজমল শর্মা, কমরেড ছজ্জুরাম রাওত, কমরেড ফিরোজ খান বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড মহা সিং।

ওড়িশা

এস ইউ সি আই-এর ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ওড়িশার জেলায় জেলায় বহু সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমজীবী ও আদিবাসী সহ সমাজের সর্বস্তরের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ এই সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করেন।

পুরী, জগৎসিংপুর, জাজপুর, অনগুল ও শোনপুরে ২৪ এপ্রিল; ভদ্রক, উদালায় ২৫ এপ্রিল; বৈপারিগুদা ও রাউরকেলায় ২৬ এপ্রিল; ভোগরাইতে ২৭ এপ্রিল; কটকে ২৮ এপ্রিল এবং কেওনঝরে ২৯ এপ্রিল সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কেন্দ্রাপাড়া, খুরদা, বালেশ্বর ও রাজকণিকা, বেরহামপুর, কালাহাণ্ডি এবং যশিপুরে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়।

ওড়িশা রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড ধূর্জটি দাস, বিধায়ক শম্ভুনাথ নায়েক সহ রাজ্য সংগঠনী কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ বিভিন্ন সভায় ভাষণ দেন।

লোডশেডিং বন্ধের দাবিতে বিদ্যুৎমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ

লাগাতার লোডশেডিং বন্ধের দাবিতে ৯ মে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কয়েকশত গ্রাহক কলকাতার ধর্মতলা, হাজরা মোড় এবং বেহালা ট্রামডিপোর সামনে রাস্তা অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। তিন জায়গাতেই বিক্ষোভ শেষে লোডশেডিং বন্ধে ব্যর্থ বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুতুল দাহ করা হয়। বিভিন্ন বক্তা বিদ্যুৎমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি এবং লোডশেডিং-এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে সি ই এস সি দায়ী প্রমাণ হলে তার লাইসেন্স বাতিলের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

হাজরা মোড়ে অ্যাবেকার রাজ্য কমিটির সদস্য শিবাজী দে, ধর্মতলায় সুভাষ ব্যানার্জী এবং বেহালায় শ্যামাচরণ চক্রবর্তী বলেন, বিদ্যুৎমন্ত্রী যতই লোডশেডিং বন্ধের আশ্বাস দিচ্ছেন ততই লোডশেডিং বাড়ছে। রাজ্য সরকারের হিসাব অনুযায়ী এবং সিইএসসি-র বিজ্ঞাপন অনুযায়ী রাজ্যে যত বিদ্যুতের প্রয়োজন তার থেকে বেশি উৎপাদন হচ্ছে। তাহলে লোডশেডিং হচ্ছে কেন? আমাদের কাছে খবর আছে এই কোম্পানিগুলি মুনাফা বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের গ্রাহকদের বঞ্চিত করছে ও বিদ্যুৎ বাইরে বিক্রি করে দিচ্ছে। সরকার জেনেও চুপ করে আছে। এই বিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে।

লোডশেডিং-এর ফলে আজ জনজীবন বিপর্যস্ত। গ্রামে-গঞ্জে বোরো ধান পুড়ছে। ক্ষুদ্রশিল্প আরও সংকটগ্রস্ত হচ্ছে। চিকিৎসা, শিক্ষা সবই বিপর্যয়ের সম্মুখীন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে রাজ্যপাল রাজভবন নিষ্প্রদীপ রেখে পরিস্থিতির প্রতিবাদ করেছেন, যা একটি বিরল ঘটনা। শাসকদল সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার জন্য লজ্জিত না হয়ে রাজ্যপালকে হুমকি দিচ্ছে।

এই জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎনীতির বিরুদ্ধে বক্তারা আরও ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান।

৯ মে ধর্মতলা মোড়, বিদ্যুৎমন্ত্রীর কুশপুতুল পুড়ছে

৬৩তম ফ্যাসিবিরোধী বিজয় দিবস স্মরণে

(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হিটলারবাহিনী ১৯৪৫ সালের ৮ মে মধ্যরাতে সোভিয়েট লালফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের যুদ্ধবিরোধী জনসাধারণ ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের দিনটি স্মরণে রাখতে ৯ মে তারিখটিকে ফ্যাসিবাদবিরোধী দিবস হিসাবে পালন করেন। এই উপলক্ষে অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি বলশেভিক-এর কেন্দ্রীয় কমিটি রচিত এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হল।

— সম্পাদক, গণদাবী)

বিশ্ব ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার প্রভৃতি দিক থেকে এই যুদ্ধ অতীতের সব যুদ্ধকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধের সঙ্গে যত সৈন্য, যত মানুষ জড়িয়েছিলেন, অতীতে কোনও যুদ্ধে তত সৈন্য, তত মানুষ যুক্ত হননি। কিন্তু শুধু এটাই তার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য নয়। এই যুদ্ধ নজিরবিহীন এ জন্য যে, এই যুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল দুই মতবাদ, দুই বিশ্বশক্তি। একদিকে বিশ্বপুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের গর্ভজাত চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও চিন্তা, অর্থাৎ ফ্যাসিবাদ, অন্যদিকে অচঞ্চল প্রত্যয়দৃঢ় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্ব।

১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি জার্মান ফ্যাসিবাদ তার সম্প্রসারণবাদী নকশা কার্যকর করা শুরু করে। ১৯৩৬-৩৭ সালেই শিরোমণি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে গোপন বোঝাপড়া করে গড়ে তুলেছিল একটা আগ্রাসী জোট, যার মধ্যে ছিল জার্মানি, ইতালি ও জাপান। ১৯৩৮ সালের মার্চে জার্মানি অস্ট্রিয়া দখল করে। পরের বছর তারা দখল করে চেকোস্লোভাকিয়া। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

অনিবার্যভাবেই সোভিয়েট সীমান্তে যুদ্ধ ঘনিয়ে আসে। ইউরোপে ফ্যাসিবাদের গর্জন ক্রমাগত যখন বাড়ছিল, তখন স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি, ফ্যাসিবাদ ও তার সহযোগী তথাকথিত 'পশ্চিমী গণতন্ত্রী'দের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার জন্য বারবার আহ্বান জানানোর সাথে সাথে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন রোখার জন্য ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে গণমুক্তি ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানায়। কিন্তু তাতে সাড়া না দিয়ে 'পশ্চিমী গণতন্ত্রীরা' সোভিয়েট ইউনিয়নকে অন্ধকারে রেখে সরাসরি হিটলারের সাথে সমঝোতা করে নেয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে 'পশ্চিমী শক্তিগুলিকে' মুখের মতো জবাব দিয়ে স্ট্যালিন ১৯৩৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেন এবং তার দ্বারা জার্মান আক্রমণকে বিলম্বিত করে সমাজতান্ত্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সময় বের করে আনেন।

অনাক্রমণ চুক্তির ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের সীমান্ত ৩০০ কিলোমিটার পশ্চিমে সরে যায় এবং সোভিয়েট দেশের বিরুদ্ধে হিটলারের সামরিক অভিযান দেড় বছর পিছিয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে দেশকে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি করার অবশ্যপ্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাজগুলি বলশেভিক পার্টি করে নেয়। আধুনিক শিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থার বনিয়াদের ওপর দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ কনফারেন্সে।

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে এবং স্ট্যালিন নেতৃত্বে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সার্থক রূপায়ণের পথে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মজবুত বনিয়াদ গড়ে ওঠে। সর্বোচ্চ মানের সমাজতান্ত্রিক ভারী শিল্প গড়ে ওঠে, কৃষির যন্ত্রীকরণ হয় ও যৌথখামার তৈরি হয়, বেকারি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দেশের মেহনতি জনগণের বস্তুগত ও ভাবগত অবাধ বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়।

বিপ্লবের আগে সোভিয়েটে ৯ থেকে ৪৯ বছর বয়সী পুরুষদের ৬০ শতাংশ ও নারীদের ৮৩ শতাংশ লিখতে পড়তে জানত না। বহু জনগোষ্ঠীর ভাষার লেখার হরফ ছিল না। বিপ্লবের ২০ বছরের মধ্যে সেই দেশ বিশ্বের সেরা শিক্ষিত দেশে পরিণত হয়েছিল। ১৯৩০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে ৬২ শতাংশ মানুষ সাক্ষর ছিলেন, হাইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৯০ হাজার। ১৯৪০ সালে ৮১৭টি ইনস্টিটিউটে ৪ লক্ষ ১২ হাজার ছাত্র এবং ৩৭৭৩টি টেকনিক্যাল স্কুলে ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ছাত্র পড়াশুনা করেছিল।

চল্লিশের দশকে দেশের শিক্ষার মান এত উচ্চে উঠেছিল যে, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ সহ অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশাল উন্নতি ঘটেছিল; শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সোভিয়েট ইউনিয়ন সুউচ্চ মান অর্জন করেছিল। সোভিয়েট জনগণের সমাজতান্ত্রিক সৃজনীশক্তির বহুদূর বিকাশ ঘটেছিল।

যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে — এই চেতনা সোভিয়েট জনগণের ঐক্যকে আরও সংহত করে এবং এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় করে যে, একমাত্র সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতি ঘটানোর পথেই দেশকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা এবং আগ্রাসী শক্তিকে উপযুক্ত জবাব দেওয়া সম্ভব।

পার্টি এবং সরকারের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা শিল্পকে আরও শক্তিশালী করা হয় এবং দেশের একেবারে মাঝখানে (উরাল ও সাইবেরিয়া অঞ্চলে) নতুন সামরিক শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়, যাতে পূব বা পশ্চিম কোনও দিক থেকেই শত্রু এগুলির ওপর বিমান আক্রমণ চালাতে না পারে।

ব্যাপক অংশের জনগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে হলে সামরিক শিক্ষা ও দেশপ্রেমের গভীর চেতনা দরকার, যা মানুষকে একদিকে যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করায় উদ্বুদ্ধ করবে, অন্যদিকে বাস্তবে মাতৃভূমিকে রক্ষা করাকে পবিত্র কর্তব্য হিসাবে গণ্য করতে শেখাবে।

আর কে কে এ (লালফৌজ) এবং আর কে কে এফ-এর সদস্যদের নতুনভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা এবং সামরিক ট্রেনিং দেওয়ার আবশ্যিক কাজটি যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে সম্পন্ন করা হয়।

মাতৃভূমি রক্ষার মহান যুদ্ধ অভূতপূর্বভাবে প্রমাণ করে, সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল কতখানি দৃঢ়মূল। সেই রাষ্ট্র ও সমাজ কেবল নিজেকে অটুটই রাখেনি, শত্রুকেও ছত্রভঙ্গ করেছে। যে শত্রু গোটা ইউরোপ জয় করেছিল, যে শত্রুর কবজায় ছিল গোটা ইউরোপের অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পদ, সেই শত্রুকে সোভিয়েট দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও মহান বীরত্বের সাধনায় দীক্ষিত সাধারণ মানুষই চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারবিরোধী জোটে অন্যান্য দেশও যোগ দিয়েছিল, কিন্তু প্রধান দায়িত্ব নিতে হয়েছিল সোভিয়েট ইউনিয়নকে।

১৯৪১-এর ২২ জুন নাগাদ জার্মানি দখল করে ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, গ্রীস, হল্যান্ড ও লুক্সেমবুর্গ। হিটলার তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। যুদ্ধের শুরুতেই জার্মানি ও তার বশংবদেরা ১৯০ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে সোভিয়েটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এপ্রিলের মধ্যেই সোভিয়েটের বিরুদ্ধে নামানো হয় ২৩৩ ডিভিশন সৈন্য, যেখানে উত্তর আফ্রিকার ফ্রন্টে ছিল মাত্র ১৪ ডিভিশন সৈন্য। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে, যেসব ফ্রন্টে মার্কিন বা ব্রিটিশ সৈন্য জার্মানির মোকাবিলা করছিল, সেখানে জার্মানি যত সৈন্য নামিয়েছিল, এক সোভিয়েট সীমান্তেই তার ১৮ থেকে ২০ গুণ সৈন্য নামিয়েছিল। যুদ্ধের শেষে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট লিখেছিলেন — ''রণকৌশলের দিক থেকে বিচার করলে ...একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, হিটলারবিরোধী জোটের বাকি ২৫টি রাষ্ট্রের বাহিনী যত শত্রু সংহার করেছিল, এক রুশবাহিনীই তার চেয়ে বেশি শত্রুসৈন্য নিপাত করেছে।''

১৯১৭ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সর্বহারা বিপ্লবের অর্জিত প্রকৃত সামাজিক সাফল্যগুলি রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে, মাতৃভূমি রক্ষার মহান যুদ্ধে সোভিয়েটের লক্ষ লক্ষ মানুষ অকল্পনীয় আত্মত্যাগ ও ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেছে। সোভিয়েট মাতৃভূমিকে রক্ষার মধ্য দিয়ে তারা শ্রমজীবী জনগণের অধিকার, বিশ্রামের গ্যারান্টি, বিনা বেতনে শিক্ষা, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা, সংস্কৃতির বিশ্বজনীন বিকাশ, অবহেলিত জাতিগুলির অকল্পনীয় সামগ্রিক বিকাশ ও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যতকেই রক্ষা করেছে। সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি রক্ষার এই সংগ্রামের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির সমুন্নত রাজনৈতিক চেতনা স্বীকৃতি পেয়েছে যোদ্ধাদের অসামান্য পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার ঘটনায়। ৭৩ লক্ষ যোদ্ধা বিভিন্ন সম্মান ও মেডেলে ভূষিত হয়েছেন। ১৯,৬০৩ জন 'হিরো অব সোভিয়েট ইউনিয়ন' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন (এঁদের মধ্যে ১০৪ জন দু'বার এবং তিনজন তিনবার সম্মানিত হয়েছেন)। ঘোড়সওয়ার বাহিনীর ২৫০০ জন গৌরবজনক সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। আকাশযুদ্ধে অন্ততঃ ৬০০ বার যাঁরা শত্রুর উপর আক্রমণ চালিয়েছেন, সেইসব বৈমানিক পুরস্কৃত হয়েছেন। প্রাপ্ত সম্মানসূচক সমস্ত পদক ও ব্যাজে ৪৭০ জনের পুরো শরীর ঢেকে যেত। এঁদের মধ্যে ছিলেন রুশ, বেলোরুশ, ইউক্রেনীয়, কাজাখ, উজবেক, আর্মেনীয়, জর্জিয়, আজারবাইজানি, কিরঘিজ, তাজিক ও অন্যান্য সোভিয়েট জাতিগুলির প্রতিনিধিরা।

মাতৃভূমি রক্ষার এই মহান যুদ্ধে সোভিয়েট জনগণ ও তাদের লালফৌজের বিজয়ের ভিন্নতর মূল্যও আছে। যুদ্ধে গিয়ে যাঁরা ফিরে আসেননি, সেই সৈন্যসংখ্যা হল ৮৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪০০ জন, সামরিক ও অসামরিক মিলিয়ে মোট ২ কোটি থেকে ২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। জাতীয় সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ৬৫ হাজার মাইল রেলপথ, শত সহস্র কলকারখানা, যৌথ কৃষি খামার, সমাজতান্ত্রিক কৃষি খামার, লক্ষ লক্ষ গৃহপালিত পশু, ১৭১০টি শহর ও গঞ্জ, ৭০ হাজার গ্রাম ধ্বংস হয়েছে। আড়াই কোটি সোভিয়েট নাগরিক রক্তাল্পতার শিকার হয়েছেন।

পশ্চিমী অর্থনীতিবিদরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় নিয়ে যেতে ৫০ থেকে ৭৫ বছর লাগবে। বিপরীতে পুনর্গঠনের পর্যায়ে ১৯৫০ দশকের শেষদিকে এই কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ সোভিয়েট জনগণ স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির পরিচালনায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় সফল হয়েছে এবং জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন করেছে বছর দশেকের মধ্যেই।

সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে যাঁরা সমরক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন, সেই বীরদের সম্মান চিরস্থায়ী হোক। সর্বহারা বিপ্লব জিন্দাবাদ।

মধ্যপ্রদেশে মে দিবস উদ্‌যাপন

১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র উদ্যোগে জবলপুরের কাঁচঘর চকে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি কমরেড ভবানী ঘোষ। সেখানে অনুষ্ঠিত এক সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সম্পাদক কমরেড বিনোদ খারে। এক প্রভাতফেরি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সতপুলায় উপস্থিত হলে সেখানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ হোরিলাল বিশ্বকর্মা, ভবানী ঘোষ এবং অনিল মালহোত্রা। তাঁরা সকলেই সরকারের সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে যুক্তআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

নন্দীগ্রাম

রাজ্যপাল ও মানবাধিকার কমিশনের কাছে এম এস এসের স্মারকলিপি পেশ

নন্দীগ্রাম পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে সি পি এম ক্রিমিনালদের দ্বিতীয় দফায় আক্রমণ ও ১৮ এপ্রিল ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সদস্য রাধারানি আড়ির দ্বিতীয়বার গণধর্ষিতা হওয়ার প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদল রাজ্য মানবাধিকার কমিশনচেয়ারম্যান শ্যামল সেন ও রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

২ মে, এম এস এস রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড়ের নেতৃত্বে কমরেডস কৃষ্ণা সেন, ভারতী রায়, ও প্রণতি কর বিচারপতি শ্যামল সেনের সাথে দেখা করে আলোচনা করেন। তিনি সমস্ত বিষয়টি শোনেন এবং জেলাশাসক, পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও হাসপাতাল সুপারকে নিরপেক্ষ তদন্ত করার নির্দেশ দেন।

৭ মে রাজ্যপালের সঙ্গে হাসি হোড়ের নেতৃত্বে যে প্রতিনিধিদল দেখা করেন, তাতে ছিলেন কবি শতরূপা সান্যাল, অধ্যাপিকা চৈতালি দত্ত, কৃষ্ণা সেন, ভারতী রায় ও প্রণতি কর। স্মারকলিপিতে নন্দীগ্রামের প্রতিবাদী নারীদের উপর সি পি এম ক্রিমিনালদের নারকীয় অত্যাচারের সুনির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করা হয়। গোকুলনগরের বাসিন্দা রাধারানি আড়ির উপর গণধর্ষণকারী সি পি এম ক্রিমিনালদের নাম রাজ্যপালকে জানানো হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, ৫ মে কিয়াখালির মালতী জানা সিপিএমের মিছিলে হাঁটতে অস্বীকার করায় তাঁকে প্রকাশ্য রাস্তায় মারা হয়, বিবস্ত্র করা হয় এবং সেই অবস্থায় তিনি বাঁচার জন্য ছুটতে থাকেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে নন্দীগ্রামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, নারীর নিরাপত্তাহীনতা ও চূড়ান্তভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। অবিলম্বে এই ফ্যাসিস্ট অত্যাচার বন্ধ ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশ

নন্দীগ্রামে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ৯ মে ফ্যাসিবাদবিরোধী দিবসে শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের উদ্যোগে কলকাতা মেট্রো চ্যানেলে সমাবেশ। বক্তব্য রাখেন মঞ্চের সভাপতি প্রখ্যাত কবি তরুণ সান্যাল।

বেকারদের কাজ দেওয়ার সিপিএমের প্রতিশ্রুতির নমুনা

সিপিএম সরকার নাকি এ রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। নেতারা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের কথা ভাবতে হবে। কিন্তু সত্যিই কি নেতা-মন্ত্রীরা তাদের কথা ভাবছেন, নাকি সবটাই ধাপ্পাবাজি?

টাটা কোম্পানির মোটরগাড়ি কারখানা তৈরির জন্য সিপিএম সরকার সিঙ্গুরের অতি-উর্বর হাজার একর চাষের জমি কেড়ে নিয়েছে। কেমিকেল হাব করার নামে চাষের জমি কেড়ে নিয়ে নন্দীগ্রামেও অগণিত মানুষকে পথের ভিখারি করার পরিকল্পনা ছিল তাদের, সেখানকার বীর জনসাধারণের অসাধারণ সংগ্রাম রুখে দিতে পেরেছে সেই ষড়যন্ত্র। প্রতিশোধ নিতে দলীয় ক্রিমিনালদের লেলিয়ে দিয়ে নন্দীগ্রামের মাটি প্রতিবাদী কৃষকের রক্তে ভিজিয়ে দিতে কসুর করেনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যদের এই সরকার।

রাজ্যে নাকি শিল্পায়ন করতে হবে; তবেই হবে রাজ্যের উন্নয়ন, হবে কর্মসংস্থান। মুখ্যমন্ত্রী গত ফেব্রুয়ারি মাসে বলেছেন — ''কাজ আর কাজ। এটাই আমাদের লক্ষ্য।'' বলেছেন, শালবনীতে ইস্পাত শিল্পে ১৮ হাজার ছেলেমেয়ের কাজ হবে, সিঙ্গুরে কাজ পাবে ৬ হাজার মানুষ, নন্দীগ্রামের বদলে নয়াচরে যে পেট্রোকেমিকেল হাব তৈরি করার কথা চলছে, তাতে ১ লক্ষ মানুষ কাজ পাবে।

একা মুখ্যমন্ত্রী নন, এ রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী সহ সমস্ত নেতা-মন্ত্রীরাই আগামী দিনে কী হারে কাজের সুযোগ পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য তাঁরা এনে দিতে চলেছেন, তার ফিরিস্তি দিতে ব্যস্ত।

এদিকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফানুস ইতিমধ্যেই ফেটে গেছে। টাটার কারখানায় চাকরি হবে — সিপিএম নেতাদের এই আশ্বাসে সিঙ্গুরের যে মানুষগুলো জমি দিয়েছিলেন, তাঁদের পরিবারের কিছু যুবকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলেও আজ পর্যন্ত চাকরি হওয়ার কোনও চিহ্নও কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। এমনকী যাঁরা টাটা প্রকল্পে পাহারাদারের কাজ পেয়েছিলেন, ইতিমধ্যেই তাঁদের ৩০০ জন ছাঁটাই হয়ে গিয়েছেন। বাকিদেরও কাজ থাকবে না বলে শিল্পোন্নয়ন নিগম জানিয়ে দিয়েছে। (সূত্রঃ বর্তমান, ১১-৫-০৮)। সংবাদে প্রকাশ, সিঙ্গুরে ভোটের প্রচার করতে গিয়েএই কারণে সিপিএম নেতাদের স্থানীয় মানুষের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে।

তবে সিপিএমের এ আচরণ নতুন নয়। অতীতে হলদিয়ায় পেট্রোকেমিকেল কারখানা স্থাপনের সময়ও তাঁরা বলেছিলেন, সেখানে লক্ষ লক্ষ বেকারের চাকরি হবে। সেই উপলক্ষে সিপিএম যে সব বিরাট বিরাট পদযাত্রা করেছিল, একটা কাজ পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে অসংখ্য যুবক-যুবতী সেগুলিতেসামিল হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ লক্ষ বেকারের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই চাকরির স্বপ্ন কালো মেঘে ঢেকে গেল। বর্তমানে হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের মূল প্ল্যান্টে কাজ করছেন লক্ষ লক্ষ নয়, মাত্র ৭০০ জন স্থায়ী এবং ১২০০ জন ঠিকা কর্মী।

সরকারি কর্তাদের মুখে প্রায়ই 'অনুসারী' শিল্পের কথা শোনা যায়। সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামে শিল্প হলে সেখানে অনুসারী শিল্পে বহু মানুষ কাজ পাবেন বলে নেতা-মন্ত্রীরা এখনও ঢাক পিটিয়ে চলেছেন। হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলস প্রসঙ্গেও, অনুসারী শিল্পে অনেক মানুষের কাজ হবে বলে হাওয়া গরম করা হয়েছিল। অথচ হলদিয়ার অনুসারী শিল্পে কাজ পেয়েছেন মাত্র ২৫ হাজার ১৯৪ জন। খোদ রাজ্য সরকারের শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরই এই তথ্য সরবরাহ করেছে (সূত্র ঃ বর্তমান, ৭-২-০৮)।

শুধু তাই নয়। হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে আজ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে বহু কল কারখানা। বন্ধ হয়ে গেছে হিন্দ কনটেনার প্রাইভেট লিমিটেড, ইউরেকা কেমিকেলস, আধুনিকীকরণের নামে গত বছর থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে পেট্রোকার্বন অ্যান্ড কেমিকেলস। পাঁচ বছর ধরে উৎপাদন হচ্ছে না সাইমন ইস্পাত কারখানায়, উৎপাদন হতে না হতে বন্ধ হয়ে গেছে খেতাবত কেমিকেলস। ১০ বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে শ ওয়ালেস, রাজ্য সরকারের যৌথ মালিকানার কনসোলিডেটেড ফাইবার অ্যান্ড কেমিকেলস বন্ধ হয়েছে দেড় বছর আগে, কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনও বন্ধ (সূত্র ঃ বর্তমান, ১৫-৪-০৮)। এতগুলি বন্ধ কারখানার কয়েক হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর জীবন আজ চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে। রাজ্যের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের চিন্তায় সিপিএম সরকারের নাকি ঘুম নেই, অথচ হলদিয়ার এইসব বন্ধ কারখানাগুলি নতুন করে খোলাবার জন্য তাঁদের এতটুকুও উদ্যোগ নিতে দেখা যাচ্ছে না। কাজ-হারানো এইসব মানুষগুলি কীভাবে বেঁচে আছে, সে বিষয়েও চূড়ান্ত উদাসীন এই সরকার।

এ রাজ্যের বহু শিল্পাঞ্চলই আজ শ্মশানের মতো নিথর। কল্যাণী শিল্পাঞ্চলে যেখানে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ১৪৪টি কলকারখানা ছিল, কাজ করতেন ১ লক্ষের মতো শ্রমিক, সেখানে আজ বেশির ভাগ কারখানাই বন্ধ। কর্মচ্যুত লক্ষ শ্রমিকের জীবনে আজ শুধুই গাঢ় অন্ধকার। বুদ্ধদেববাবু বা তাঁর সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা, যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবকদের দুঃখে দু'বেলা চোখের জল ঝরাচ্ছেন, ভাব দেখাচ্ছেন যেন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য জীবনপাত করতে চলেছেন, কাজ-হারানো এই মানুষগুলির জন্য সামান্য দরদ দেখাতে তো তাঁদের দেখা মেলে না! কেন এই কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গেল, কী করলেই বা এগুলি নতুন করে চালু করা যায় — সে সব নিয়ে তো কখনও তাঁদের মাথা ঘামাতে দেখা যায় না! এই বন্ধ কারখানাগুলি খোলার অতিপ্রয়োজনীয় কাজটি না করে তাঁরা বেকারত্বের যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা তরুণ-তরুণীদের, শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের মিথ্যা আশায় ভুলিয়ে ভোটের বাজার মাত করার স্বপ্নে মশগুল। লক্ষ লক্ষ বেকারের সামনে চাকরির মিথ্যে টোপ ঝুলিয়ে আসলে তাঁরা টাটা-আম্বানি-সালিমদের অবাধে মুনাফা লোটার ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। জনদরদের মুখোশ পরে পুঁজিমালিকদের পায়ে জনসাধারণকে বলি দিচ্ছেন।

নন্দীগ্রামে ব্যাপক সন্ত্রাস ও হামলার প্রতিবাদে ৭ মে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ। রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হচ্ছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in